৩০ এপ্রিল ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

Hard Copy - Library
Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

আপনার বাচ্চাদের দেদার মজার সময়ে সঙ্গ দিতে কিসানের দলে এল নতুন সাথী, বলুন তো এ কে?

মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, উইনি দি পুঃ, গুফী—এদের মধ্যে যে কোন একজন আপনার কাছে আসবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে; প্রতিটি গ্লাসের সাথে; প্রতিটি কিসান স্কোয়াশ বা ক্রাশের বোতলের সাথে।

তাজা স্বাদে ভরপুর—কিসান স্কোয়াশ ও ক্রাশ। সবচেয়ে ভালভাবে ঝাড়াই-বাছাই করা মরশুমী ফলের থেকে তৈরী। এতে পাবেন আকণ্ঠ পরিতৃপ্তি; একদম বিনা পরিশ্রমে। চিনি দেবার হাঙ্গামা নেই; তাই সরবৎ তৈরী হবে এক পলকে।

হাতের কাছেই রাখুন কিসানের একটা বোতল। কিংবা তার চেয়েও ভাল হয় যদি তৃপ্তিতে ভরা কিসানের তাজা ফল-সরবতের যে কোনও বোতল বা সবকটা বোতলই কিনে ফেলেন, আর তার সঙ্গে বাচ্চাদের জন্য ঘরে নিয়ে যান ডিজনী-রূপকথার পুরো দলটাকে।

© 1983 Walt Disney Productions.

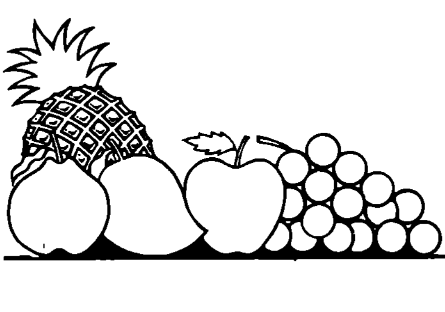

স্কোয়াশ এবং ক্রাশ

অরেঞ্জ, পাইনাপল, লেমন, ম্যাঙ্গো, লেমন-বার্লি।

অরেঞ্জ, পাইনাপল, রোজ ও খুশসিরাপের সঙ্গেও গ্লাস পাওয়া যাবে।

এ উপহার কিন্তু সীমিত—
স্টক যতদিন থাকে, আর শুধুমাত্র
কয়েকটি বাছাই শহরের জন্য।

Kissan

MAA(S) KPL 1B BEN 86

আনন্দমেলা

১৭ বৈশাখ ১৩৯৩ ☐ ৩০ এপ্রিল ১৯৮৬ ☐ ১২ বর্ষ ২ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
রবীন্দ্রনাথের টয়ট্রেন ভ্রমণ । রতন বিশ্বাস ৪
সম্পূর্ণ উপন্যাস
নয়ন গেল বনে । নিখিলচন্দ্র সরকার ৩৫
গল্প
জনার্দনবাবুর কুকুর । সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ৯
রাজার মাথায় শিং । কিরণশঙ্কর মৈত্র ১৮
মেজদার তিন নম্বর । চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ২৫
জানালায় মুখ । অরবিন্দ ভট্টাচার্য ২৮
তিন ভূত এক মোক্তার । মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫
ধারাবাহিক উপন্যাস
ডোরাকাটা জামা । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১৫
ছড়া ও কবিতা
মনে মনে । শিবশম্ভু পাল ৭
খুকুর রবিঠাকুর । রত্নেশ্বর হাজরা ৭
চেনা-অচেনা । অশোককুমার মিত্র ৭
ইচ্ছে ছিল । তরুণ সান্যাল ৮
শার্লক হোমসের গল্প
নতুন চাকরি । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১
বিজ্ঞানবিচিত্রা
নব্যপ্রস্তর যুগ । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৩
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৩
লেখাপড়া
অশনি…শর্বরী…(অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ১৪
ছবি (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ১৪
খেলাধুলো
শাবাশ নিউজিল্যান্ড । অজয় বর্মা ৬২
এশিয়ার সেরা আশা । রত্না শূর ৬৩
'সত্তরের যুদ্ধে' মোহনবাগান জিতল । সম্রাট রায় ৬৫
ক্রিকেটারদের গল্প । অশোক রায় ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১,
গাবলু ৬০
অন্যান্য আকর্ষণ
ডাক্তারবাবু বলছেন । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৫৯
খেয়ালখুশির মেলা । সুনয়ন ৫৯
তোমাদের পাতা ৪৮, ধাঁধা ৩২, শব্দসন্ধান ৩২
মজার খেলা ৩৩, হাসিখুশি ৩৩
জেরেমি কোনির পুরোপাতা রঙিন ছবি ৬১

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তোমাদের জন্য এখন আমাদের
পাঁচ-পাঁচটি

চিলড্রেন্স কাউণ্টার

রিচি রোড শাখা
১৭/২, রিচি রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯

গড়িয়াহাট শাখা
১এ, ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস, কলিকাতা-৭০০০১৯
(প্রবেশ পথ গড়িয়াহাট রোড)

সন্তোষপুর শাখা
১১৭, সন্তোষপুর অ্যাভেনু, কলিকাতা-৭০০০৭৫

**সল্টলেক সিটি
বিধাননগর শাখা**
বিডি-৯৮, সল্ট লেক সিটি, কলিকাতা-৭০০০৬৪

কলেজ স্ট্রীট শাখা
৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

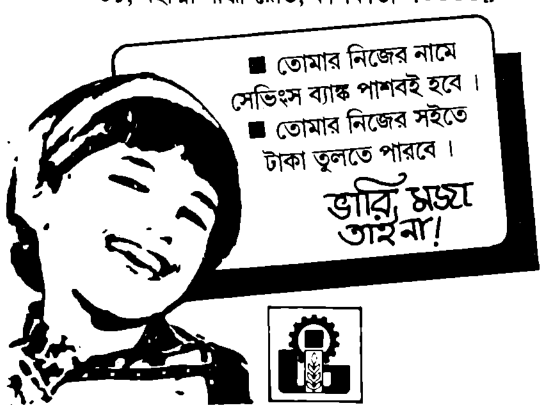

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
সেন্ট্রাল অফিস :
"পার্ক সেন্টার" ২৪ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬
হেড অফিস :
১৭, আর এন মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
রেজিঃ অফিস :
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১

রবীন্দ্রনাথের টয়ট্রেন ভ্রমণ

রতন বিশ্বাস

পাহাড়ের উপর কবির আকর্ষণ কৈশোর থেকে। হিমালয়ের হাতছানি তিনি বারবার পেয়েছেন। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। দার্জিলিঙে তিনি অনেকবার এসেছেন। কাজেই টয়ট্রেনেও বহুবার চড়েছেন।

একসময় দার্জিলিঙে যাওয়ার পথ-পরিক্রমা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। একশো বছর আগেকার কথা বলছি। সেইসময় গঙ্গার এপারে গোটা উত্তরবঙ্গের লোকসংখ্যা, ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাট খুবই নগণ্য ছিল। সেদিনের শিলিগুড়ি ছিল খুবই ক্ষীণকায়, নামমাত্র শহর। হিলকার্ট রোডের উপর রেললাইন ছিল। একটিমাত্র স্টেশন। রাস্তার পাশে দোকান-পসার হাতে গোনা যেত। শিলিগুড়ি ছাড়াবার পর গভীর জঙ্গল। সেদিনের শুকনা এবং আজকের শুকনার অনেক তফাত। জঙ্গল থেকে হাতিরা বীরদর্পে এসে রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে পড়ত।

এই সময় কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে যাতায়াতের মুখ্য মাধ্যম ছিল রেলওয়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার দার্জিলিং এলেন ১৮৮২ সালের অক্টোবরে অর্থাৎ শরৎকালে। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন। এই সময়ে পাহাড়ে উঠতে গোরুর গাড়ি, টাট্টু, পালকি ব্যবহার হত।

১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৭৭ সাল সময়কালে দু'ভাবে শিলিগুড়ি যাওয়া যেত। ই· আর· আর ট্রেনে সাহেবগঞ্জ গিয়ে রাস্তা ধরে শিলিগুড়ি এবং ওখান থেকে টাঙায় টুং পর্যন্ত; অন্যভাবে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেনে শিয়ালদহ থেকে পোড়াদহ, সেখান থেকে কিছুদূর হেঁটে ভেড়ামারা পৌঁছে পদ্মা পার হয়ে সারা-য় (সাঁড়া) গিয়ে বাকিটা হেঁটে যেতে হত। এই রেলওয়েতে চারটি শ্রেণী ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে বসবার বেঞ্চি ছিল না। লোকে বিছানা পেতে বসত। সেখান থেকে বাইরের কিছু দেখা যেত না। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট ছিলেন ফ্র্যাংকলিন প্রেস্টেজ (Frankline Prestage) ১৮৭৮। ১৮৭৮ সালে ১৯ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল: "Proposal of a steam tramway from Siligoree to Darjeeling." এই সনেই কলকাতার সি মিটাল অ্যান্ড রামসে কোম্পানিকে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ট্রামওয়ে তৈরির ভার দেওয়া হয়।

ওই বছরের শেষে জামালপুর ওয়ার্কশপে টয়ট্রেনের প্রথম ইঞ্জিন তৈরি হয়ে গেল। তার নাম দেওয়া হল 'টাইনি'। ওই সময় গয়াবাড়ি থেকে গিড্ডা পাহাড় পর্যন্ত ট্রাম লাইন পাতা হল। টাইনি কাজে লাগে ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে। ভাইসরয় লর্ড লিটন যখন আসেন, তখন ১৮ মাইল খুদে রেলপথ সম্পূর্ণ হয়েছে। লাইন খোলার তারিখ:

ক· শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং ২৮-৮-১৮৮০
খ· কার্শিয়াং থেকে সোনাদা ১-২-১৮৮১
গ· সোনাদা থেকে ঘুম ৪-৪-১৮৮১
ঘ· ঘুম থেকে দার্জিলিং ৪-৭-১৮৮১

১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দার্জিলিং এলেন। তখন শিয়ালদহ থেকে বড় ট্রেন বিকেল ৪টায় ছাড়ত, দামুকিয়ায় (পদ্মার পাড়ে) পৌঁছত রাত ৯টায়। দামুকিয়া থেকে সারাঘাট এবং তারপর দার্জিলিঙের পর্যটনের সঙ্গী টাইনি। এই সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস। বিয়ে হয়নি।

এরপর তিনি ১২৯৪ সালের শরৎকালে (অক্টোবর ১৮৮৭) সপরিবারে দার্জিলিং এলেন। সপরিবার বলতে সঙ্গে চতুর্দশী স্ত্রী ও এক বৎসরের শিশুকন্যা বেলা। আর ছিলেন সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হিরন্ময়ী ও সরলা। এই ভ্রমণপর্বে, বিশেষ করে রেলপথের অভিজ্ঞতা কবি একান্ত ব্যক্তিমানস দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি দার্জিলিং থেকে বালিকা ইন্দিরাকে (১৪) কলকাতায় এক পত্রে লিখছেন (১৬·৯·১৮৮৭): "এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বেলি খুব ভালোরকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদেনি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারাঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি

শুকনা ফরেস্টের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে টয়ট্রেন। এ-ছবি সেই পুরনো আমলের। তুলেছিলেন জে· বার্লিংটন স্মিথ।

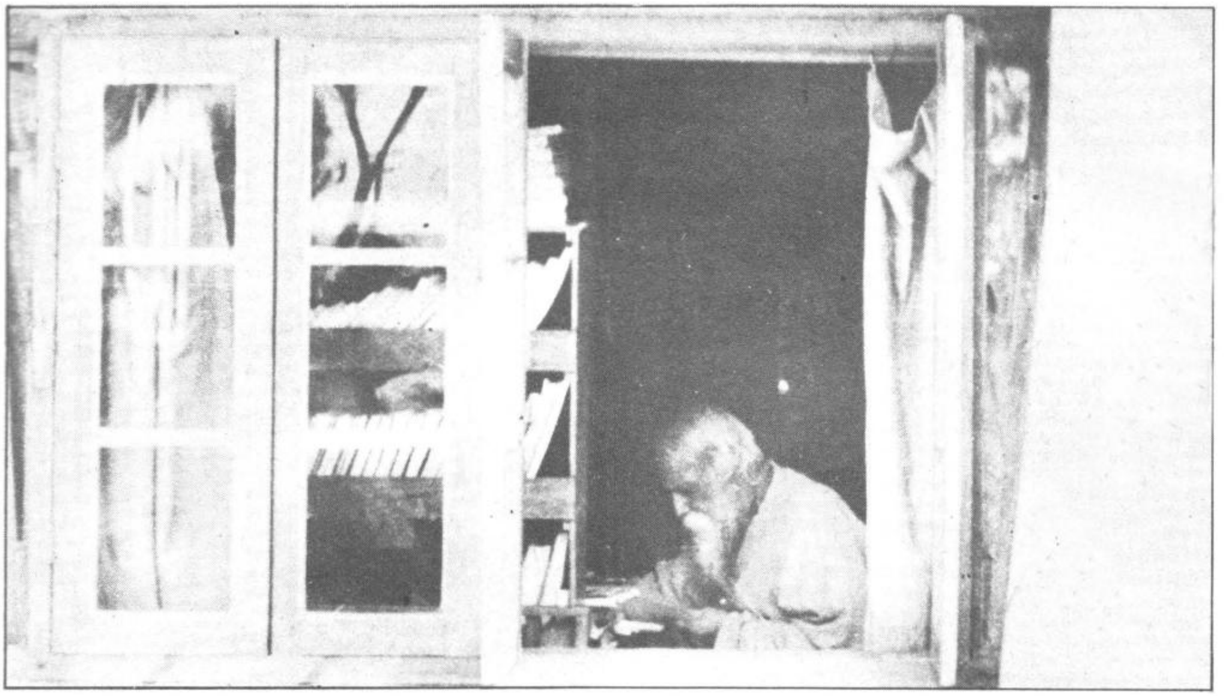

দশটা—জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল—তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাখন সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিসপত্র Ladies' Compartment-এ তোলা গেল—কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি—তবু নদিদি বলেন—আমি কিছুই করিনি। অর্থাৎ আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে-সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে platformময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেইরকম মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠান্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed। কিন্তু এই দু'দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নিচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-Phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। ...যাক্। তারপরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়—তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল ?' লক্ষ্মী থাকলে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত ; সে হয়তো বলত, 'তিনি দার্জিলিং ছিল কিন্তু তখন দার্জিলিং বড়ো ঠান্ডা ছিলেন বলে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিতমত এরকম বাংলা জোগালো না।

"সিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছ্বাসউক্তি—exclamations। 'ওমা কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'—কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবিমামা দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়—কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে, কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দুঃখ করছে যে রবিমামা দেখতে পেলে না, কিন্তু তার জন্যে রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। গাড়ি চলতে লাগল। বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্না মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ঠান্ডা তারপরে মেঘ, তারপরে নদিদির সর্দি, তারপরে বড়দিদির হাঁচি, তারপরে শাল কম্বল বালাপোশ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্, হাত ঠান্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার, এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং।"

এই পত্রের ভাষায় এবং বিষয়ে একটা সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। কবির প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধ, যাত্রাপথের সূক্ষ্ম বর্ণনা-বৈচিত্র্য খুব সহজ সরলভাবে উপভোগ করা যায়। বিশেষ করে চলন্ত টয়ট্রেনের ভিতরের বাইরের যে-ছবি তিনি শব্দের টানে এঁকেছেন তা অপূর্ব।

টয়ট্রেনে রবীন্দ্রনাথই শুধু আনন্দ পাননি, দীর্ঘ একশো বছরে লক্ষ লক্ষ পর্যটক সকলেই মজা পেয়েছেন। টয়ট্রেন কখনও পুরনো হয়নি, হয়ও না। আজও শুকনা থেকে দার্জিলিঙের রাস্তায় ধস নামে, রেললাইন বন্ধ হয়, টয়ট্রেন চলে না। আবার লাইন পরিষ্কার হয়। বীরদর্পে টয়ট্রেন চলে ঝিক্ ঝিক্, মেঘ ফুঁড়ে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে, পাহাড়ি ফুল গাছ লতাপাতা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। সেই পুরনো দিনের মতো ছেলেরা নামে আর ওঠে।

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিণ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

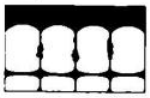

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

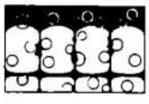

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী খাবারের কণাগুলো বার করে আনে, রোগজীবানু হ'তে দেয় না।

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল, নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর। নিশ্বাসে দূর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়! আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

B84.55 Ben

কি তাজা মিণ্টি স্বাদ!

মনে মনে

শিবশম্ভু পাল

বয়েস যখন পাঁচ কি ছয়
সরস্বতী মাইকি জয়,
প্রথম ভাগের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে,
একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ
সাড়ে উনতিরিশ লক্ষ
ময়ূরপঙ্খী নৌকো করেছি রে !

পাঁচ দু'গুনে দশ বছরে
পড়ল চোখে একনজরে
পোষ-ফাগুনে কান্নাহাসির দোলা ;
কচি পাতা হলুদ পাতা
বদলে গেছে এ-কলকাতা
পাতালে পা, আকাশে হাত তোলা

ধিন কেটে তাক ধিন কেটে তাক
ঘড়ির কাঁটা, মুখ ফিরে থাক,
ওই কাগজের নৌকোগুলি ডাকে,
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ছুটির দিনের মেঘলা দুপুর
মনে মনে, পঁচিশে বৈশাখে ।

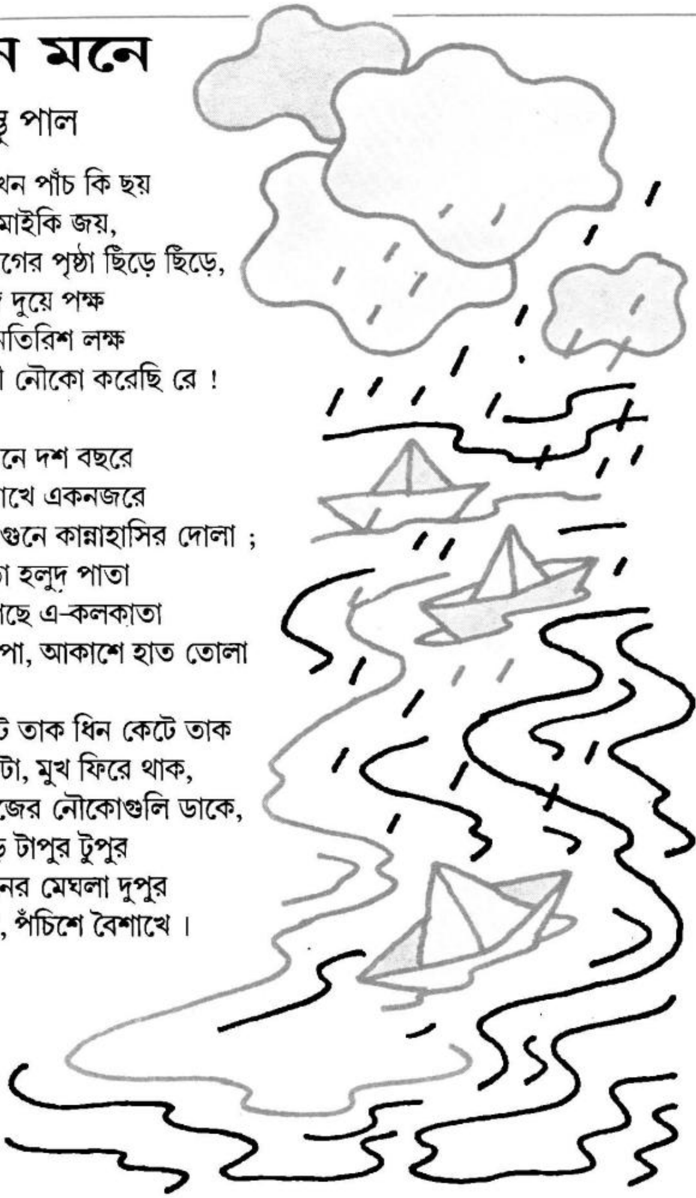

চেনা-অচেনা

অশোককুমার মিত্র

সওয়া শো বছর আগে,
শহর জুড়ে ছিল না তো'
আকাশ-ছোঁওয়া বাড়ি,
ছুট দিত না মাটির নীচে
পাতাল-রেলের গাড়ি ;
কলকাতা কি চিনতে পারে
প্রাচীন কলকাতাকে ?

শহর জুড়ে সেদিন ছিল
খন্দ এবং খানা,
বনের গন্ধ সেই তখনও
আসত হাওয়ায় ভেসে,
সন্ধে হলেই ঝুপ করে ভূত
নামত শরীর ঘেঁষে,
কলকাতাতে ছিল তাদের
মৌরুসি আস্তানা ।

বাংলাভাষার আকাশ সেদিন
ভোরের রেখা ক্ষীণ
রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন
সওয়া শো বছর আগে ।
তাঁরই হাতে বাংলা ভাষার
ঝলমলাল দিন,
চিনতে পারে কেউ কি এখন
প্রাচীন ভাষাটাকে ?

ছবি : দেবাশিস দেব

খুকুর রবিঠাকুর

রত্নেশ্বর হাজরা

বৈশাখে রোদ জ্বালায় পোড়ায়
শুকোয় নদী পুকুর,
হঠাৎ তখন বৃষ্টি হয়ে আসেন রবিঠাকুর ।

আষাঢ় শাওন ছিচকাদুনে—
ভাল্লাগে না খুকুর,
মেঘের আড়ে রোদ হয়ে তা-ও হাসেন রবিঠাকুর ।

শরৎ দ্যাখে মুখখানা তার—
কাজলদিঘি মুকুর,
পদ্ম হয়ে ভাসেন তখন খুকুর রবিঠাকুর ।

হেমন্ত যায় কেবল পড়ায়—
পরীক্ষা যে খুকুর !
ভাগ্যি, বইয়ের পাতায়-পাতায় থাকেন রবিঠাকুর ।

শীতের দিনে হাল্‌কা পড়া—
একটু বেশি খেলা,
খুকুর গানে রবিঠাকুর সকাল সন্ধেবেলা ।

নীল দিগন্তে ফুলের আগুন
যখন লাগে, খুকুর
শিমুল হয়ে পলাশ হয়ে আসেন রবিঠাকুর ।

ইচ্ছে ছিল

তরুণ সান্যাল

ছেলেবেলায় ইচ্ছে ছিল ঢের
জমিরচাচার মতন হব চাষা,
দুটি বলদ একটি লাঙলের
পিছন পিছন হাঁটব ভরা আষাঢ়।

প্রথম বর্ষা ঢল নামাবে খালে,
নায়েগ্রা বা যেমন ভিক্টোরিয়া—
ইচ্ছা ছিল ধরব খ্যাপলা জালে
সরপুঁটি-কৈ, সঙ্গী জমির মিঞা।

এবং নদীখালের কাটাকুটির
পরেই হাটের নৌকো ছিল হাজার,
বড়ল ব্রিজের ওপার জুড়ে ছুটি
মাঠ চষা মাছ ধরায় ও এক মাজার।

জ্যোৎস্না ছিল ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে
ছিল অশথপাতায় তারার চাষ,
নদীর ট্যাঁকে কাশের থোবা নুয়ে
আর ছিল সেই উড়াল বুনোহাঁস।

কিন্তু আমার হওয়া হল না চাষা
ভেজা মাটির গন্ধ গেলাম ভুলে,
দেখছি বৃষ্টি পড়লেই বানভাসা
শহর যেন ভরাট কূলে-কূলে।

এখন দেখছি ছাপাখানার পোকা
একটি একটি অক্ষরে পায় গিট,
কাগজপত্রে হরেক লেখাজোখায়
আলমারিতেও সাজানো থানইঁট !

কেউ জানে ওই বইপত্তর চাষ
সভ্যভব্যজনের যেমন কাজ,
আঁকশি পেতে কাটায় বছর-মাস
ইচ্ছে ধরব ঘাই-তোলা রুইমাছ !

এখন ভারী চশমা চোখে, আর
চোখ খুললেও দেখি কেবল বাড়ি,
আকাশে এবং মাটির নীচে তার
সরুমোটার বুনোট আড়াআড়ি !

যে সব ইচ্ছে ছিল কোন্ এক গ্রামে,
সে গ্রাম এখন চলচ্ছবির মতো,
ভিন্ন দেশে আছি ভিন্ন নামে,
কে মনে রাখে বালকবেলা অত !

কাগজে পড়ি পিয়াং ইয়াং, সিউল,
বার্লিন বন্ খোলে নতুন খাতা,
ব্যারাকঘরের দুঃখী খোকার প্রিয়
পালেস্তিনের অলিভবীথির মাথা।

কিন্তু আমার ছেলেবেলার মাঠ
কিন্তু আমার ঢেউ-ভাসানো নদী,
ফিরিয়ে দিলে কার কিসে ঝঞ্ঝাট—
আমার চাষা হওয়াই-বা কার ক্ষতি !

ছবি : প্রবীর সেন

জনার্দনবাবুর কুকুর

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

জনার্দনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া আর সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হওয়ার ঘটনাটা যে বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। কথাটা এইজন্যে বলছি যে, জনার্দনবাবু আর আমার মানসিকতা একেবারে পরস্পরের বিপরীত।

জনার্দনবাবু বৈজ্ঞানিক, নামকরা গবেষক ও পণ্ডিত। আর তারই সঙ্গে মস্ত একজন কুকুরপ্রেমিকও বটে। আমি সেক্ষেত্রে কুকুর একেবারেই পছন্দ করি না। কুকুরের কাছাকাছি এলেই মনে হয়, তারা কামড়াবার ফিকির খুঁজছে। পথেঘাটে কুকুর দেখতে পেলেই আমি একশো হাত দূর দিয়ে হাঁটি। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমার বন্ধুবান্ধবদের কারও বাড়িতে কুকুর থাকলে ভুলেও সে-মুখো হতে চাই না। বন্ধুরা আমার এই কুকুরভীতি নিয়ে প্রচুর ঠাট্টাতামাশা করে থাকে। আমি কিন্তু কুকুর সম্পর্কে আমার মত পাল্টানোর কোনও রকম চেষ্টাই কখনও করিনি।

অথচ আমার মতো সেই কুকুরবিদ্বেষী মানুষও একদিন কুকুরকে ভালবাসতে আর পছন্দ করতে শুরু করেছিল। ব্যাপারটা আশ্চর্য শোনালেও সত্যি।

জনার্দনবাবুর মতো গুণী মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ছিল না। হঠাৎই ব্যাপারটা ঘটে যায়।

আমার কলেজের এক পুরনো বন্ধু অমল একদিন আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। অনেকদিন তাকে দেখিনি, তাই বেশ অবাকই হলাম। আরও অবাক হয়ে গেলাম অমলের কথা শুনে। "আজ বিরাট একটা ডগ-শো হচ্ছে। দেখবার মতোই ব্যাপার। আমি যোগ দিচ্ছি। তুই তো কুকুর দেখলেই ভিরমি খাস, তাই তোকে আজ সঙ্গী করে নিয়ে যাব।"

অমল জানত কুকুর আমার দু'চোখের বিষ, তাই ওর কথাটাকে তামাশা বলেই ভেবেছিলাম।

কিন্তু অমল ছাড়ার পাত্র নয়। তার পাল্লায় পড়ে তাই হাজির হতেই হল ময়দানে। বলতে গেলে অমল আমাকে প্রায় টেনেই নিয়ে গেল।

সুন্দর শামিয়ানা খাটিয়ে জায়গাটা ঘেরা হয়েছিল। বেশ মনোরম পরিবেশ। জীবনে কোনওদিন এ-ধরনের ডগ-শো

দেখতে আসিনি। ভিতরে ঢুকে তাই তাজ্জব বনে যেতে হল।

অসংখ্য প্রতিযোগী এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বিচিত্র সব কুকুর। এত সব বিচিত্র আকারের কুকুর আমি কখনও দেখিনি। এমন সমস্ত কুকুর সেখানে দেখতে পেলাম, যে কুকুর কস্মিনকালেও আছে বলে জানতাম না। নেড়িকুত্তা ছাড়া ওই এক অ্যালসেশিয়ানই আমি চিনি।

অমল আমাকে একটা ভাল জায়গায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার আগে দু-এক জাতের কুকুর অমল আমায় চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

অমল চলে গেলে বসে-বসে চারদিকে তাকিয়ে নানা পোশাকের স্ত্রী পুরুষ আর বিভিন্ন রকমের কুকুর দেখে সময় কাটাচ্ছিলাম। এক-একটা কুকুর যেমন বিরাট, তেমনই ভয়ঙ্কর। আবার কোনও-কোনওটা সত্যিই চমৎকার। লোমে ঢাকা তাদের শরীর।

হঠাৎই দেখতে পেলাম, অমল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। আমার দিকে তাকিয়ে ও কাছে যেতে ইঙ্গিত করল। বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সেখানে হাজির হলাম।

অমল ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, "ইনি হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জনার্দন চৌধুরী। ওঁর আরও একটা গুণ আছে, উনি একজন বিখ্যাত কুকুরপ্রেমিক। অদ্ভুত সংগ্রহ আছে ওঁর·· এ হচ্ছে আমার বন্ধু সুজিত মিত্র।"

আমি দু'হাত তুলে নমস্কার করলাম।

অমল হেসে আবার বলল, "সুজিত কুকুরকে বড্ড ভয় পায়। কোনওভাবে ওর ভয়টা দূর করা যায় জনার্দনবাবু ?"

রাশভারী মানুষ বলেই ভেবেছিলাম জনার্দনবাবুকে। কিন্তু অমলের কথাটা শুনে তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন, "বেশ তো, চেষ্টা করতে দোষ কী ? রবিবার সকালে আমার কেয়াতলার বাড়িতে আসুন, একটু গল্পও করা যাবে।" জনার্দনবাবু কথাটা বলেই পকেট থেকে তাঁর কার্ড বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু অমল বলে উঠল, "নিশ্চয়ই যাবে ও, ভাববেন না।"

এরপর জনার্দনবাবু প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য চলে গেলেন। অমলও তাই। আমিও আবার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বসলাম।

প্রতিযোগিতা যথাসময়ে শেষ হল। জনার্দনবাবু বেশ কিছু পুরস্কার পেলেন। তিনটে বিভাগে তাঁর কুকুরই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হল।

এরপর রবিবার এসে গেলে বাধ্য হয়েই জনার্দনবাবুর বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। সকাল নটা নাগাদ বেরিয়েও পড়লাম।

যাওয়ার পথে একটা চিন্তাই আমাকে চেপে ধরেছিল। তা হল জনার্দনবাবুর বাড়ির কুকুর। শুনেছিলাম, তাঁর বাড়িতে নানা জাতের কুকুরের সংগ্রহ আছে। কথাটা ভেবে বেশ ভয়-ভয় করতে লাগল। অমল আমাকে কী ঝামেলাতেই ফেলেছে। ভাবতে-ভাবতেই দশটা নাগাদ জনার্দনবাবুর কেয়াতলার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম।

বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না, জনার্দনবাবুর কার্ড সঙ্গেই ছিল। তা ছাড়া খ্যাতিমান মানুষ। বেশ বড় একতলা বাড়ি, পাঁচিল ঘেরা। সামনেই লোহার গেট, তারই সামনে এক গোর্খা দরোয়ান বসে ছিল। দরজায় একটা বোর্ডে বেশ বড় হরফে লেখা, 'কুকুর হইতে সাবধান'।

দরোয়ান আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। সে বলল, "আসুন বাবুজি, হুজুর ভিতরমে হ্যায়।"

বুঝলাম জনার্দনবাবু তাকে আগেই আমার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন।

গেটের মধ্যে ঢুকতেই বুকটা কেঁপে উঠল। চারপাশে বেশ খোলামেলা জায়গা। বিশাল চেহারার তিন চারটে কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরকম কুকুর আগে দেখিনি। কুকুরগুলো আমাকে দেখতে পেয়েই ঘেউ-ঘেউ করে তীরবেগে ছুটে এল।

আতঙ্কে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই জনার্দনবাবু এসে পড়লেন।

"আসুন, সুজিতবাবু, আসুন। ভয় নেই," জনার্দনবাবু বললেন। কুকুরগুলো তাঁর ইশারায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

জনার্দনবাবু আবার বললেন, "এ হল ডোবারম্যান। এমন প্রভুভক্ত কুকুর দুনিয়ায় নেই। প্রভুর হুকুম পালন করার জন্য এরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমার সব কুকুর আমার প্রতিটি ইঙ্গিত বোঝে।"

এবার জনার্দনবাবুর পিছনে-পিছনে তাঁর বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম।

বেশ বড় ঘর। দেয়ালে অসংখ্য কুকুরের ছবি। আমার অবাক হওয়া চোখের দিকে তাকালেন জনার্দনবাবু।

"পৃথিবীতে কত জাতের কুকুর আছে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। এরাই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সুজিতবাবু। কুকুর কখনওই বিশ্বাসভঙ্গ করে না। এদের কাছে টেনে নিন, দেখবেন মানুষের সখ্য কত ঠুনকো," জনার্দনবাবু বললেন।

গোর্খা দরোয়ানই এরপর চা নিয়ে এল।

জনার্দনবাবু বললেন, "এই বাড়িতে মানুষ বলতে আমরা দু'জনে, আমি আর বাহাদুর। আর আছে আমার কুকুরেরা। আমি কারও সঙ্গে বড় একটা মিশি না। চলুন, চা খাওয়া যাক, তারপর আমার কুকুরের সংগ্রহ দেখাব। আপনার সঙ্গে আমি দেখা করলাম অপনাকে ভাল লেগেছে বলেই।"

জনার্দনবাবুর কথাগুলো চুপচাপ শুনে গেলেও, আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। ব্যাপারটা কী প্রথমে বুঝতে পারিনি। আচমকা পিছনে তাকাতেই শরীর হিম হয়ে গেল।

বিরাট আকারের কুচকুচে কালো ভয়ঙ্কর-দর্শন একটা কুকুর ঠিক আমারই পিছনে দাঁড়িয়ে !

ওরকম ভয়াল কোনও কুকুর আমি কোনওদিনই দেখিনি। আতঙ্কে আমার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না।

জনার্দনবাবু আমার অবস্থা দেখে কুকুরটাকে ইঙ্গিত করতেই জনার্দনবাবুর কোলের উপর থাবা তুলে দাঁড়াল, "এই আমার সবচেয়ে প্রিয় কুকুর, টিবেটান ম্যাস্টিফ", জনার্দনবাবু বললেন, "এ-জাতের কুকুর সহসা পাবেন না। এই আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী, আমার দেহরক্ষীও বলতে পারেন।"

"আপনার ভয় করে না ?" কাঁপা গলায় বললাম।

"ভয় ? কুকুরকে ? না, ভয় পাই শুধু মানুষকেই।"

কুকুরটাকে আমি ভাল করে দেখলাম এবার। কী ভয়ঙ্কর হিংস্র চেহারা। কালো লোমশ দেহ। দেখামাত্রই বুক কেঁপে ওঠে।

"চলুন, এবার আমার বাকি কুকুরের সংগ্রহ দেখাব," জনার্দনবাবু বললেন।

সত্যিই তাজ্জব হয়ে গেলাম জনার্দনবাবুর সংগ্রহ দেখে। কত রকম কুকুর দেখালেন তিনি, ডোবারম্যান, হাউন্ড, স্প্যানিয়েল, টেরিয়ার, রিট্রিভার আর সেই ভয়ঙ্কর টিবেটান ম্যাস্টিফ।

কুকুরের বিষয়ে আরও নানা তথ্য আমাকে শোনালেন জনার্দনবাবু। তাঁর সংগ্রহে কুকুর সম্পর্কে বইও আছে প্রচুর।

আস্তে-আস্তে আমিও কখন যেন কুকুরকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। জনার্দনবাবুর কথা আমাকে যেন সম্মোহিত করে তুলছিল।

প্রথম দিন কথায় কথায় কখন দুটো ঘন্টা কেটে গিয়েছিল, টের পাইনি। বেলা প্রায় বারোটার সময় বিদায় নিয়েছিলাম।

সেই শুরু। এরপর প্রায়ই জনার্দনবাবু আমাকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতেন। আমিও কেমন উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। অথচ এ সত্ত্বেও আমার বুকের মধ্যে একটা কাঁপন শুরু হত জনার্দনবাবুর বাড়ির কাছাকাছি এলেই। সেই টিবেটান ম্যাস্টিফটার কথা ভাবলেই কেমন ভয়-ভয় করত। ভয়ানক কুকুরটা সারাক্ষণ গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে জনার্দনবাবুর।

জনার্দনবাবুর কথাটাই সম্ভবত ঠিক, কুকুরটা তাঁর দেহরক্ষী।

এইভাবেই দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে গেল। অফিসের একটা কাজে আমাকে মাস তিনেকের মতো কলকাতার বাইরে চলে যেতে হল। ব্যস্ততায় জনার্দনবাবুকে চিঠি লিখে উঠতেও পারিনি।

কলকাতায় ফিরেই একদিন পৌঁছলাম কেয়াতলায়।

গিয়ে বেশ একটু ধাক্কা খেলাম। গোর্খা দরোয়ানের ব্যবহার ভাল লাগল না। সে যেন আমাকে চেনেই না এমনভাবে জানাল, জনার্দনবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না, তিনি বাড়ি নেই।

আমি একটু বিমর্ষ হলাম। কিন্তু ও কী ! একতলার ঘরের একটা জানালা দিয়ে একখানা মুখ সাঁত্‌ করে সরে গেল যেন !

অন্য সময় হলে কিছু ভাবতাম না। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি সে মুখ আর কারও নয়, স্বয়ং জনার্দনবাবুর !

ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। জনার্দনবাবুর এমন ব্যবহারের কারণ কী ?

বেশ অপমানিত বোধ করেই সেদিন ফিরে এসেছিলাম। এ সত্ত্বেও রহস্যটা কী জানার জন্যেই আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত একদিন আমার সেই বন্ধু অমলেরই শরণাপন্ন হলাম।

অমল বলল, "কেন, তুই জানিস না ? জনার্দনবাবুর প্রিয় টিবেটান ম্যাস্টিফ কুকুরটা হঠাৎ মারা যাওয়ায় তিনি কেমন হয়ে গেছেন। কারও সঙ্গেই আর মেশেন না। এমনকী পরিচিত জনের সঙ্গেও না।"

এরপর জনার্দনবাবুর কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। কিন্তু তারপরই ঘটে গেল আশ্চর্য সেই ঘটনা।

শিয়ালদহ স্টেশনের কাছাকাছি একটা রাস্তা ধরে ফিরছিলাম। বেশ রাত হয়েছিল। একটা গলির মধ্যে ঢুকতেই চোখে পড়ল টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে, কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ দেখলাম গলির অন্য দিক থেকে একজন হেঁটে আসছেন। সত্যিই এবার একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, কারণ ওঁকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। উনি নিশ্চয়ই জনার্দনবাবু।

জনার্দনবাবু আমাকে চিনতে পেরেছিলেন কি না জানি না; কিন্তু পরক্ষণেই এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যে সে নিয়ে ভাবনার কোনও অবকাশই রইল না।

আচমকা দু'জন লোক যেন অন্ধকার ফুঁড়ে জনার্দনবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তাদের একজনের হাতে একটা ভোজালি আর অন্যজনের হাতে একটা ছোরা।

আমার বুক কেঁপে উঠল। ওরা নিশ্চয়ই জনার্দনবাবুর সবকিছু এখনই কেড়ে নেবে, তাঁকে মেরেও ফেলতে পারে। কিন্তু আমি খালি হাতে তাঁকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বুঝতে পারলাম না।

আমার ওই ভাবনা মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখের নিমেষে ঘটে গেল। কোথা থেকে বিশাল চেহারার কালো কুচকুচে লোমশ একটা কুকুর গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোক দুটোর উপর।

আমার কানে এল মানুষের গলার আর্ত চিৎকার। সে আর্তনাদ শুনে আমার শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল।

আমি আর দাঁড়াইনি। পাগলের মতোই উলটো পথ ধরে ছুটতে শুরু করলাম।

সারারাত আমার ঘুম এল না, শুধু ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন দেখলাম। পরদিন সকালে কাগজে দেখলাম, খবর বেরিয়েছে দু'জন দাগি আসামির মৃতদেহ পুলিশ আবিষ্কার করেছে। দুজনেরই কণ্ঠনালী কোনও হিংস্র জন্তুর কামড়ে ছিন্নভিন্ন। পুলিশ এই রহস্যের কিনারা করতে পারেনি।

এ-ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আমি। আমি জানি ওই হিংস্র প্রাণী জনার্দনবাবুর সেই প্রিয় টিবেটান ম্যাস্টিফ, তাঁর সেই বিশ্বস্ত দেহরক্ষী।

কিন্তু জনার্দনবাবুর ম্যাস্টিফ কুকুরটা তো মারা গেছে। আর গলিতে ধারেকাছেও কুকুরটা ছিল না।

তা হলে ?

এর জবাব আমি আজও পাইনি।

ছবি : প্রকাশ মাইতি

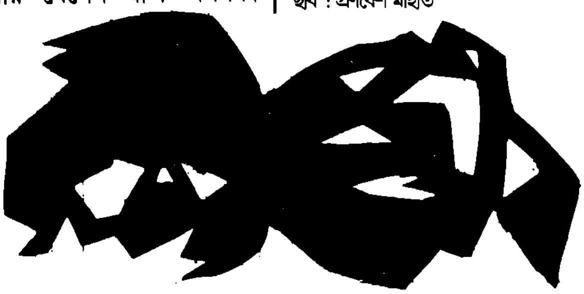

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ

শক্ত আহারের আদর্শ শুরু

আপনার বাচ্চা ৪-মাসে পড়লেই দুধের সঙ্গে ওর দরকার শক্ত আহারের। তখন থেকেই ওকে দিতে শুরু করুন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

সম্পূর্ণ পুষ্টির লাভ ঃ সেরেল্যাকের প্রতি আহারে আছে আপনার বাচ্চার জন প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টি উপাদান — প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস্, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এইসব উপাদান, সঠিক মাত্রায় সুষম ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

চমৎকার স্বাদের লাভ ঃ সেরেল্যাক শুধু পুষ্টিকরই নয়, চমৎকার স্বাদেও ভরপুর। সেরেল্যাকের স্বাদ তাই বাচ্চাদের দারুন মুখরোচক।

সময় বাঁচার লাভ ঃ সেরেল্যাক এক তৈরী আহার। দুধ ও চিনি তাতে দেওয়াই থাকে, শুধু ফোটানো ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে নিলেই হলো—চট্‌পট্ খাবার তৈরী।

আপনার বাচ্চার সুষম পুষ্টির জন্য সেরেল্যাক আহার স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী করতে টিনের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী দয়া ক'রে সঠিক্ ভাবে মেনে চলুন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক পুস্তিকার জন্য
এই ঠিকানায় লিখুন ঃ সেরেল্যাক
পোষ্টবক্স নং-৩
নিউদিল্লী-১১০০০৮

Nestlé

SAA/FSL/C/3799 (R) BEN

সেরেল্যাকের যত্ন : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ-স্বাদে অনন্য

নব্যপ্রস্তরযুগ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নব্য বলতে নতুন। পুরনো পাথরের যুগের শেষাশেষি, আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে এই নতুন যুগের শুরু। এতদিন প্রকৃতিদত্ত জিনিস কুড়িয়েবাড়িয়ে আর মেরেধরে মানুষকে চালাতে হয়েছে। খুঁজেপেতে যা পাওয়া যায়, তা জোগাড় করে দিন-আনি দিন-খাই করে চালানো। এবার শুরু হল খোদার ওপর খোদকারির যুগ। শুধু কুড়ানো নয়। ফলানো। শুরু হল কৃষিকাজ আর পশুপালন।

গোড়ায় এশিয়া, মিশর আর মধ্যপ্রাচ্যের কতকাংশে আর তার কিছু পরে মেক্সিকোয় মানুষ গম, যব আর সেইসঙ্গে নানারকম দানাশস্যের চাষ করতে শিখল।

খাবারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর বদলে মানুষ এবার এক জায়গায় জনপদ বেঁধে থিতু হয়ে বসল। এইভাবে যাযাবরের দল হল চাষিবাসী গৃহস্থ। বনবাদাড় মাঠঘাট ঠেঙিয়ে বাইসন আর বুনোশুয়োরের পেছনে না ছুটে ঘরে ঘরে তারা গোরু ছাগল ভেড়া আর শুয়োর পুষতে লাগল। মাংসের জন্যে শিকারে যাবার আর কী দরকার? পোষা জীবগুলোকেই তো তারা ইচ্ছেমতো কেটে খেতে পারে।

কর্মজগতে এই আমূল পরিবর্তনের ফলে মানুষের এতদিনকার কষ্টের কত যে লাঘব হল বলার নয়। জীবনে এল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। অনাহারের জ্বালা আর নিত্য অভাবের হাত থেকে মানুষ ছুটি পেল। সোয়াস্তিতে থাকতে পেরে লোকসংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল।

ফলে, বাড়তি লোক নতুন নতুন এলাকায় চলে গিয়ে নতুন নতুন গ্রামের পত্তন করল। চাষবাস আর পশুপালনের ফলে মানুষ হাতে আগের চেয়ে ঢের বেশি সময় পেল। নানা জিনিস ভাববার আর পরখ করে দেখবার সময় পেয়ে নতুন নতুন কাজে হাত দেবার সুযোগ এল।

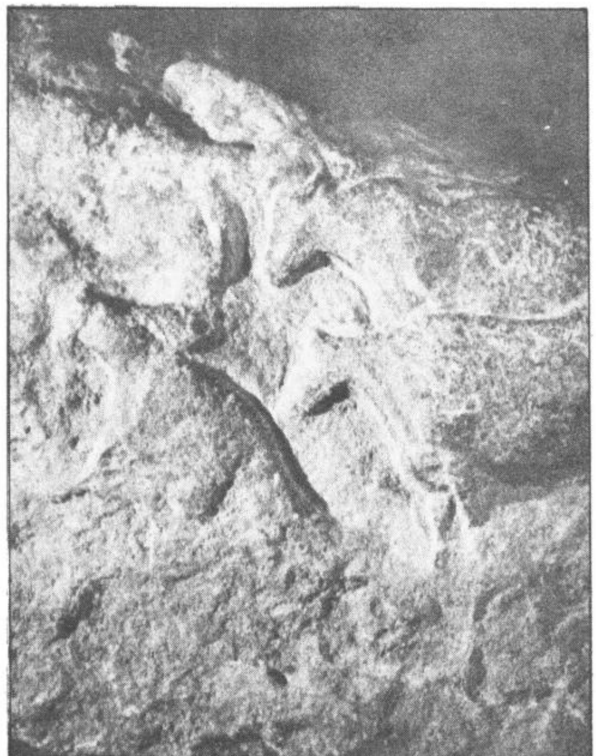

পাথরে উৎকীর্ণ গোমূর্তি (প্রাগৈতিহাসিক মানুষের শিল্পকলার এই নিদর্শন ফ্রান্সে আবিষ্কৃত হয়েছে)

মাটির থালাবাসন তৈরি হল। রান্নাবান্নাও আগের চেয়ে ভাল হল। খাবারদাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভাল ব্যবস্থা হল। শণ আর রেশম দিয়ে সে-যুগের মানুষ কাপড় বুনতে শিখল।

সেই সঙ্গে দিনকে-দিন মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারও বেড়ে যেতে লাগল।

জেনে নাও

গরমের দিনে খসখসে জল দিলে ঘর ঠাণ্ডা হয় কেন

গরমের দিনে ঘরে অনেক সময়ে জলে ভিজিয়ে খসখস টাঙানো হয় ঘর ঠাণ্ডা হবে বলে।

কেন?

চারপাশ গরম। খসখসের জল বাষ্প হয়ে উবে যায়। এই উবে যাওয়ার জন্যে যে তাপ দরকার, সে তাপ সে নিচ্ছে চারপাশ থেকে। এই তাপ টেনে নেওয়ার জন্যে ঘরের উষ্ণতা কমে আসে। খসখস না টাঙিয়ে কেউ যদি ঘরের পর্দা সব ভিজিয়ে দিত, তা হলে ঘর ঠাণ্ডা লাগত। কিন্তু খসখসের একটা গন্ধ আছে, সেই গন্ধটা সকলের ভাল লাগে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

অশনি…শর্বরী…

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার পর যদি প্রশ্ন করি, এ-গানের অর্থ জানো তো ?—তখন তুমি যদি এড়িয়ে যাবার জন্য জবাব দাও, 'হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানিনে', তবে তা দুঃখের কথা । কথার অর্থ জানা থাকলে তবেই গান শোনার আনন্দ পায় পূর্ণতা । নীচের শব্দগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের । প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে । সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে । শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে ।

১ । **ফাল্গুনী**—(ক) অর্জুন, (খ) ফাল্গুনমাসের ফসল, (গ) ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা, (ঘ) বসন্তের আনন্দ ।

২ । **অশনি**—(ক) আলোক, (খ) সূর্য, (গ) আগুন, (ঘ) বজ্র ।

৩ । **সঘন**—(ক) কৃষ্ণবর্ণ, (খ) মেঘযুক্ত, (গ) প্রচণ্ড, (ঘ) গাঢ় ।

৪ । **মেদুর**—(ক) মোটা, (খ) কালো, (গ) স্নিগ্ধ, (ঘ) স্থির ।

৫ । **শর্বরী**—(ক) মেঘ, (খ) বিদ্যুৎ, (গ) অন্ধকার, (ঘ) রাত্রি ।

উত্তর : ১ । **ফাল্গুনী**—(গ) ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা, যা সৌন্দর্যময় । যেমন, 'তাই নিয়ে মনে মনে/ রচি মম ফাল্গুনী ।' ২ । **অশনি**—(ঘ) বজ্র । যেমন, 'তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি ।' ৩ । **সঘন**—(খ) মেঘযুক্ত । ঘন শব্দের একটি অর্থ মেঘ ; সহিত এই অর্থে স । যেমন, 'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা ।' সঘন শব্দের অন্য অর্থ হল বার বার । যেমন, 'দাদুরি ডাকিছে সঘনে ।' ৪ । **মেদুর**—(গ) স্নিগ্ধ । যেমন, 'অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে ।' ৫ । **শর্বরী**—(ঘ) রাত্রি । যেমন, 'ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া ওঠে, হায় ।'

দেব-সেনাপতি

ছবি

মিলি একটা বিলেতি মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল । চম্বল মনোযোগ দিয়ে গল্পের বই পড়ছিল । বাবা আর মা সংসার খরচ কী করে কমানো যায় তাই নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন ।

"Look, Dada," Milly cried, "Isn't this a pretty cottage?"

She was pointing at a picture of a nice little cottage. It had a red-tiled roof, and honey-suckle on its walls, and it stood in a lush green valley. A small brook ran close to it.

Milly said, "I want to live in a cottage like this.

"Do you?" Chambal asked. "There'd be no T.V. in it, you know. And no cinema-halls within hundreds of miles. I want you to think of that.

Before Milly could reply, Mr Roy asked the children what they were talking about. Milly showed him the picture.

"Yes, it does look rather nice, doesn't it?" he said. "But I'm afraid you'd find it rather lonely there. In a little while you'd begin to long for someone to come and take you out of this place."

"But, of course, Daddy," Milly protested, "I want you and Mummy and Dada to come and live with me there."

"I don't want to go," Chambal said.

এর আগের বার ইংরেজি বাক্যের এই কাঠামোটার কথা বলছি :

Subject-Verb-Object. (SVO)

যেমন :

I want you.

আবার এমনও হয় :

I / want/ to live.

I / don't want / to go.

কিন্তু এখানে দ্যাখো :

I / want / you to come.

এখানে :

"You" is not the object.

The object is "you to come."

তেমনি আবার

You / would long / for someone to come.

প্রসাদ

ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : লজেন্স কিনতে গিয়ে হরেনদার দোকানে নিতুকে দেখল রুকু। নিতুর গায়ে ডোরাকাটা নীল জামা। ইস্কুলের ফাংশানে পলাশ দুষ্টুমি করে নিতুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছিল। সুকু উঠে পলাশকে ঘুসি মারে। পুলিশ এসে রুকুকে হাতকড়া পরায়। কিন্তু পলাশের বাবা চোরাই-কারবারের দায়ে গ্রেফতার। সুকু এ-ব্যাপারে হদিস দেওয়ায় জেলাশাসক তাকে পরিত্যক্ত একটি চিড়িয়াখানা উপহার দেন। হরেনদার খাওয়ার বহর দেখে কমল ভৌমিক তাঁকে ব্যায়াম করাতে বদ্ধপরিকর। তারপর···

কমল ভৌমিক খপ করে হরেনদার হাতের কব্জি চেপে ধরলেন।

হরেনদা বললেন, "কী জ্বালা। এ কেমন রসিকতা মশাই। এই বয়েসে ডন-বৈঠক?"

"ডন-বৈঠকের কোনও বয়েস নেই মশাই। যে-কোনও বয়সেই শুরু করা যায়।"

হঠাৎ ঝনঝন করে কিছু খুচরো পয়সা পড়ার শব্দ হল। একটা পঞ্চাশ পয়সা গড়িয়ে চলে গেল রুকু আর সুকুর চেয়ারের মাঝখান দিয়ে একেবারে কোণে।

কমল ভৌমিক হরেনদাকে বললেন, "আপনার পকেটে ছ্যাঁদা আছে নাকি?"

হরেনদা প্রশ্ন করলেন, "ছিদ্র?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিদ্র? তা না হলে পয়সা পড়ল কী করে?"

"আমার পয়সা! আমার পয়সা পড়ে গেল?"

হরেনদা পয়সা কুড়োতে শুরু করলেন। একবার ওঠেন, একবার বসেন। বার দশেক হল। শেষে হাঁপাতে-হাঁপাতে চেয়ারে বসলেন। বসামাত্রই কমল ভৌমিক বললেন, "দিন, পয়সাগুলো দিন।"

"এই যে বললেন আমার পয়সা।"

"ছ্যাঁদা আছে আপনার পকেটে?"

"কই, না তো?"

"তা হলে আপনার পয়সা হয় কী করে। আমি ইচ্ছে করে ফেলেছিলুম। দেখলেন তো, সহজেই আপনি ওঠ-বোস করতে পারেন! কী, শরীরটা এখন আগের চেয়ে বেশ ফিট মনে হচ্ছে না?"

হরেনদা বুক চিতিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কোমর আর হাঁটু দুটো বেশ ছেড়ে গেল মশাই।"

"আমার আরও অনেক কায়দা আছে, যেমন ধরুন, আমি আপনাকে এমন তীরবেগে ছোটাতে পারি, যা আগের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দেবে। ওলিম্পিকের ছোটা।"

"আমাকে ছোটাবেন? এই শরীরে আমি ছুটব? ছোটার পর আমি বেঁচে থাকব! পাগল হয়েছেন আপনি?"

"আমি কেন ছোটাব। আমার টেকনিক আছে। আপনি নিজেই ছুটবেন। প্রাণ ভয়ে ছুটবেন। ছোটাবে একটা কেঁদো বাঘ। পরীক্ষা করতে চান? চলুন আমার সঙ্গে।"

হরেনদা উঠে দাঁড়ালেন। খুব খাওয়া হয়েছে। মুখটা একেবারে তুলতুলে নরম। ডাঃ মুখার্জি বললেন, "কী, উঠে পড়লেন যে!"

"হ্যাঁ, এবার যাই। বেশ ভয়ে ভয়ে আছি। ব্যবসা-ট্যবসা আর করা যাবে না মশাই। সাপের ন্যাজে পা পড়েছে। ঘুরে ছোবল না মারে!"

কমল ভৌমিক বললেন, "কী রকম, কী রকম?"

"ওই যে কালকের ব্যাপারটা। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। ওরা কি সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র!"

কমল ভৌমিক বললেন, "তাই নাকি! তা হলে আর কয়েক দিন থেকে যাই। বহুদিন তেমন ভালভাবে মারামারির সুযোগ পাইনি। ঈশ্বরের কৃপায় সেই সুযোগ এবার আসবে মনে হচ্ছে। এক ঘুসিতে আপনি কটা দাঁত ফেলতে পারেন?"

"একটাও না। একবার একজনকে একটা ঘুসি হাঁকড়ে সাতদিন হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পড়ে ছিলুম। যাকে মেরেছিলুম, সে রোজ এসে খবর নিয়ে যেত, আর দুঃখ প্রকাশ করে যেত।"

কমল ভৌমিক বললেন, "সব কিছুর একটা কায়দা আছে। সেটা আগে শিখে নিতে হয়। আজই আপনাকে ঘুসি মারার কায়দাটা শিখিয়ে দেব।"

হরেনদা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, "আমি যে আর ঘুসোঘুসি করব না, কোনও দিন করব না।"

"যাঃ, সে-কথা কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে! কে কখন কী করবে, তার কোনও ঠিক আছে মশাই? রাগ এমন জিনিস, অনেকটা ষাঁড়ের মতো। একবার বর্ষাকালে আমাদের শিমুলিয়ার বাড়ির দোতলার ঘরের জানালার পাল্লা আটকে গিয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে কাঠ ফুলে উঠেছে। কিছুতেই খুলছে না। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। প্রথমে বাবা আউট, তারপর মা আউট, দিদি আউট। এক-একজন আসছে আর পরাজিত হয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরে যাচ্ছে। লাস্ট আমি। প্রথমে নিশ্বাস নিয়ে, দম বন্ধ করে শরীরটাকে ফুলিয়ে নিলুম, তারপর গেলুম রেগে।"

"রেগে গেলেন কী করে! জানলা তো আর মানুষ নয় যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলবে!"

"তা নয়, তবে জানলাটাকে আমি মনে-মনে জীবন্ত শয়তান করে তুললুম। একগুঁয়ে, অসভ্য, ইতর, ছোটলোক। মার ব্যাটাকে। হাত মুঠো করে ঘুসি পাকালুম। কনুইয়ের কাছ থেকে ঝাঁকি মেরে, হাতের যত মাসল্ আছে সব শক্ত করে নিলুম, ঠিক এইভাবে।"

কমল ভৌমিক হরেনদার থেকে তিন-চার পা পিছিয়ে এলেন, তারপর দেখাতে লাগলেন। প্রথমে শ্বাস নিয়ে ফুলে উঠলেন। শ্বাস বন্ধ করে ফুলে রইলেন। ঘুসি পাকিয়ে হাত ঝাঁকালেন। সে এক ভীষণ চেহারা। সেই চেহারা দেখে হরেনদা আর্তনাদ করে উঠলেন, "আমি জানলা নই। ও মশাই আমি জানলা নই। আমি হরেন।"

সুমীত ব্যবহারে বহুবিধ সুবিধে

এই মেশিনের সব কাজ তার প্রাণকেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত

এর হেভী ডিউটি মোটর না থেমে ৩০ মিনিট চলতে পারে।
বিশেষ ডিজাইনে তৈরী চারটি ব্লেড ও অল্প পরিমাণ পেষাই করার ক্যাপযুক্ত
এই সুমীত ডোমেস্টিক কিচেন মেশিন কত সহজে রান্নার
মূল সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়।

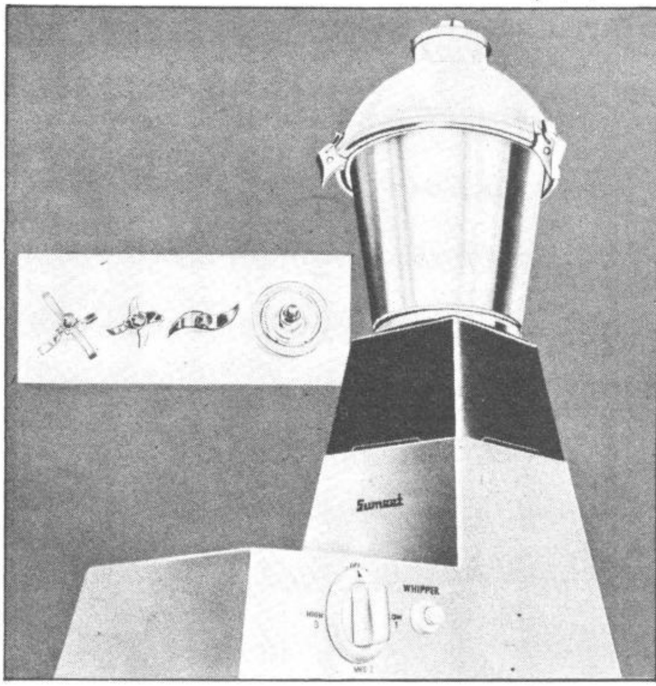

লঙ্কা আর গরম মশলা
২ মিনিটে শুকনো পেষাই।

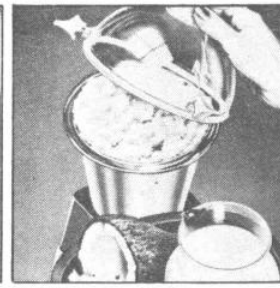

কড়াই ডাল, চাল ও নারকোলের
শাঁস ২ মিনিটে ভিজে পেষাই।

মাংস কিমা করে ১ মিনিটে আর
গাজর, পেঁয়াজ, নারকোল ও বাদাম
কুরে দেয়...কয়েক সেকেণ্ডে।

লস্যি, দুধ আর ডিমের সাদা
অংশ ফেটায় ১ মিনিটে।

এখন যোগ হ'ল সুমীত ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট

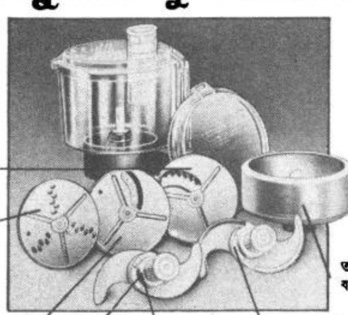

সুমীত আপনাকে দিচ্ছে আর একটা বিশেষ সুবিধে—নতুন ঐচ্ছিক ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট লাগিয়ে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন! এতে আছে স্বচ্ছ অথচ ভাঙ্গে না এমন একটি ৩.৮৮ লিটারের পাত্র, ৫টি বদলযোগ্য ব্লেড ও ডিস্ক আর রস করবার যন্ত্র। এই অ্যাটাচমেণ্টটি আপনি আপনার সুমীত ডোমেস্টিক বেসিক ইউনিটে লাগিয়ে দিন, বাস্, আর দেখুন কী বিস্ময় সৃষ্টি করে!

সুমীত®

৪০০ ওয়াট ২২০-২৪০ ভোল্ট ~ ৩০ মিনিট রেটিং

শক্তপোক্ত রান্নার ঝক্কি সামলাতে শক্তপোক্ত ভাবে তৈরী।

আমাদের বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় থাকুন আর সুমীত আপনার কি কি কাজ কি ভাবে করছে—চাক্ষুস দেখুন।

সার্ভিস সেণ্টার ঃ

কলকাতা ঃ কে দণ্ডপানি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি, ৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২৬৬৭২৮/২৯। সুমীত সার্ভিস সেণ্টার (দক্ষিণ) পি-৪৯৮ কেয়াতলা রোড, দু'তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ফোন ঃ ৪৬৬১১৬। গৌহাটী ঃ এইচ. ডি. ট্রেডার্স, ডুগার বিল্ডিং, ফ্যান্সী বাজার, গৌহাটি, আসাম-৭৮১০০১ ফোন ঃ ২৮০২৮

OBM/3187 BEN

কমল ভৌমিক ফোঁস করে শ্বাস ফেলে শরীর আলগা করে দিলেন। মৃদু হেসে বললেন, "ভাগ্যিস স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি কিন্তু আপনাকে জানলাই ভাবছিলুম, দাম্ করে এক ঘুসি মারলেই হয়েছিল আর কি! এখনও পর্যন্ত আমার বেস্ট রেকর্ড এক ঘুসিতে একত্রিশটা দাঁত। একটা নাক একেবারে পুরো চ্যাপ্টা। একটা মুখের একেবারে তিনটে প্রোজেকশান।"

হরেনদা ভয়ে ভয়ে বললেন, "প্রোজেকশান মানে?"

"মানে তিন দিকে ফুলে উঠল ঢ্যাপা হয়ে। একটা মুখ তিনমুখো হয়ে গেল। সবই কায়দা মশাই। ঘুসি মারার কায়দা।"

রুকু আর ধৈর্য ধরতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "সেই শিমুলতলার জানলাটার কী হল?"

সুকু বললে, "শিমুলতলা নয় শিমুলিয়া।"

কমল ভৌমিক হাসলেন, "সেম মিসটেক। কলকাতার মিসটেক। গড়িয়া আর গড়িয়াহাট। হাট বাদ গেলেই দশ কিলোমিটার ঠেলে নিয়ে যাবে। কী বলছিলে, সেই জানলাটা, গরাদের মধ্যে দিয়ে মারলুম এক ঘুসি সোজা রাস্তায়।"

হরেনদা বললেন, "কে, আপনি?"

"আমি কেন? জানলার দু'পাটি পাল্লা। কব্জা থেকে খুলে, সোজা রাস্তায়। তারপর পুলিশ-কেস।"

"কে? জানলা কেস ঠুকে দিল?"

কমল ভৌমিক বললেন, "অবিলম্বে খাওয়া কমান। সপ্তাহে তিন দিন অন্তত উপবাস। শরীরের সব রক্ত পেটের দিকে চলে যাচ্ছে। মাথামোটা হয়ে যাচ্ছেন।"

হরেনদা থতমত খেয়ে বললেন, "কেন, কেন? সবাই বলে, আমার ব্যবসা-বুদ্ধি খুব ভাল।"

"জানালা কি মানুষ যে কেস করবে? কেস করে দিলেন আমার কাকা।"

"কাকা! কাকা তো আপনার লোক। কাকা কেস করে দিলেন!"

"ওই যে, টাকা! টাকার লোভে কাকা কেস করে দিলেন।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আপনারা আবার বসে পড়ুন, এ-কেস অনেক দূর গড়াবে। আমি আবার চা বলি।"

"আবার চা!" একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব মুখে এনে হরেনদা বসলেন।

ডক্টর মুখার্জি সুখিয়াকে ডেকে আবার চায়ের হুকুম করলেন। সকালের দিকে দশটা এগারোটা পর্যন্ত তাঁর একটু সময় থাকে। তারপর আর কথা বলার অবসর থাকে না।

কমল ভৌমিক আবার বসে পড়লেন। পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে মুখে একটা টুকরোমতো কী ঢোকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে হরেনদা বললেন, "বদ অভ্যাস, অতি বদ অভ্যাস।"

"কী বদ অভ্যাস? বদ অভ্যাসের কী দেখলেন?"

"ওই যে সুপুরি। টুক করে একটা সুপুরি ফেলে দিলেন মুখে এই সাত সকালে?"

"ধুর মশাই, সুপুরি নয়, হরীতকী। ত্রিদোষনাশক।"

"সে আবার কী?"

"কিছুই জানেন না, কেবল গপগপ করে খেতে জানেন। হরীতকী ফল নয়। হরীতকী হল দেবতা। ত্রিদোষ মানে, বায়ু

পিত্ত কফ। হরীতকী খেলে মানুষের পরমায়ু বাড়ে। অনায়াসে একশো বছর বাঁচা যায়।"

হরেনদা লাফিয়ে উঠলেন, "আমিও তা হলে খাব," বলেই যেন মিইয়ে গেলেন। পরক্ষণেই বললেন, "কী হবে খেয়ে। কী হবে বেঁচে। বেশি দিন বাঁচা মানেই তো বেশি দুঃখ। আমি চা খাব, কাপ-কাপ চা, তেলেভাজা। তাড়াতাড়ি মরতে হবে। মরে বাঁচতে হবে।"

কমল ভৌমিক অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনছেন? ভদ্রলোকের অবস্থা দেখুন। এই রকমই হয়। ব্যায়ামের অভাবে শুধু শরীর নয়, মনও ভেঙে যায়। চলুন আজই জোগাড় করে ফেলি।"

হরেনদা বললেন, "কী জোগাড়?"

"চারখানা থান ইট। এপাশে দু'থাক, ওপাশে দু'থাক। এক হাত এক বিঘত ব্যবধানে। আর হ্যাঁ, আর একটা জিনিস চাই।"

"কী, বালি-সিমেন্ট?"

"আরে না মশাই, চাই অ্যালার্ম-ক্লক। আছে আপনার?"

"আমার একটা ওয়াল-ক্লক আছে।"

"ওয়াল-ক্লকে হবে না, চাই অ্যালার্ম-ঘড়ি। চলুন, চলুন।"

"কী হবে রে বাবা, ইট আর ঘড়ি। এ যেন চাল আর চালকুমড়ো। হাত আর হাতি।"

"আজ রাতে ভোর চারটের অ্যালার্ম দিয়ে শুতে যাবেন। ভোরে উঠবেন, মালকোঁচা মারবেন আর ইট পেড়ে ডন। এক, দুই, তিন, চার। প্রথমে বারোবার। পাঁচ মিনিট রেস্ট। আবার বারো, পাঁচ মিনিট রেস্ট। আবার বারো।"

হরেনদা উঠে পড়লেন। ডক্টর মুখার্জি বললেন, "এ কী, চললেন কোথায়?"

"আমি যাই। আমি যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ এই ভদ্রলোক কেবল ডন-বৈঠকের কথাই বলবেন। আমার আর ভাল লাগছে না। আমি পাগল হয়ে যাব। শুয়ে আর বসে আমি সারা জীবন কাটিয়েছি, এখন ইনি বলছেন ব্যায়াম করো, ব্যায়াম করো। এই ভদ্রলোককে কী ব্যায়রামে ধরেছে বলুন তো?"

হরেনদা হাঁ করে রইলেন। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

রাজার মাথায় শিং

কিরণশঙ্কর মৈত্র

গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করার দু'শো বছর পরে তিব্বতে একজন ধার্মিক রাজার জন্ম হয়েছিল। তাঁর নাম গিয়াপো ঠিরাল পাচার। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী তিনি মাথায় লম্বা চুল রাখতেন। রাজা এতই ধর্মপ্রবণ ছিলেন যে, গুরু এলে তাঁর লম্বা চুল বিছিয়ে দিতেন গুরুকে বসবার জন্যে। তারপর ধর্মালোচনায় তাঁর সময় কেটে যেত।

গিয়াপো একদিন ধর্মালোচনায় মগ্ন, হঠাৎ তাঁর ছোট ভাই লংদর্মা এসে এক কোপে তাঁর মাথা কেটে ফেলল। রাজ্যের লোকেরা, বিশেষ করে মঠের লামারা এই ঘৃণ্য পাশবিক কাজের জন্য খুব নিন্দা করলেন। যা-ই হোক, রাজা হয়ে সিংহাসনে বসল লংদর্মা।

রাজা লংদর্মাও মাথায় লম্বা চুল রাখত। কিন্তু তার একটি বিশেষ গোপন কারণও ছিল। তার মাথায় ছিল একজোড়া শিং। সেই শিং সে লম্বা চুলের তলায় লুকিয়ে রাখত। প্রত্যেক দিন রাজপ্রাসাদে একটি মেয়ে আসত রাজার কেশসজ্জার জন্যে! কিন্তু যাতে সেই মেয়েটি বাইরে গিয়ে রাজার শিংয়ের কথা কাউকে বলতে না পারে সেইজন্যে সন্ধেয় লংদর্মা সেই মেয়েটিকে মেরে ফেলত। পরের দিন কেশসজ্জার জন্যে আসত আবার কোনও নতুন মেয়ে। রাজ্যের লোকেরা কিন্তু জানত না, কেন লংদর্মা কেশসজ্জাকারিণী মেয়েদের রোজ মেরে ফেলে। তারা রাজার উপর অসন্তুষ্ট হতে লাগল। তারপর রাজা লংদর্মা আবার বৌদ্ধধর্মের উদার আবহাওয়ার পরিবর্তে পুরনো সংস্কারাচ্ছন্ন আচরণবিধির প্রচলন করতে শুরু করল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর শুরু হল নানা উৎপীড়ন।

রাজার চুল সুন্দর করে সাজিয়ে দেবার জন্যে সেদিন ডিচেন ওয়াংমো নামে একটি নতুন মেয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়েছে। রাজার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার চোখ জলে ভরে গেল, আজই তার জীবনের সমাপ্তি। লংদর্মার কানের উপর পড়ল তার গাল থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রু। রাজা পিছনে ফিরে ওয়াংমো'র দিকে তাকিয়ে তার কান্নার কারণ জানতে চাইল। ওয়াংমো তার মন্দ ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করল, এই অতি অল্প বয়সেই বিনাদোষে আজ তার প্রাণদণ্ড হবে। নিরপরাধ অসহায় মেয়েটির কথা শুনে হঠাৎ দয়া হল লংদর্মার মনে। বলল, "ঠিক আছে। আমি তোমাকে হত্যা করব না। কিন্তু খবর্দার, আমার মাথার শিংয়ের কথা কাউকে কিছু বোলো না। কেউ যেন এর বিন্দুবিসর্গ জানতে না পারে।"

শপথ করে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ওয়াংমো। দিন কেটে যায়। রাজার মাথার শিংয়ের অদ্ভুত ব্যাপারটা অন্তত একজন কাউকে বলবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে ওয়াংমো'র মন। এমন একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের ব্যাপার কাউকে বলতে না পেরে আহারে রুচি নেই ওয়াংমো'র, চোখে নেই ঘুম। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ে, রাজা লংদর্মার কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। কাউকে সে-কথা বললে তার ঘাড়ে মাথা থাকবে না। তবু থেকে-থেকে গোপন কথাটা দুধের বলকের মতো উথলে ওঠে। নাওয়া-খাওয়া ঘুম একেবারেই বন্ধ হবার উপক্রম ওয়াংমো'র। একা-একা এক কিম্ভূত রহস্য বয়ে দিনে-দিনে সে শুকিয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন আর থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের কাছে রাজা লংদর্মার মাথার শিংয়ের কথা ফিসফিস করে বলে ওয়াংমো আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিল সেই গোপন কথা। কিছুদিন পরে সেখানে গজিয়ে উঠল লম্বা সবুজ ঘাস। হাওয়ায় দুলে-দুলে সেই ঘাসগুলি বলতে লাগল, "রাজার মাথায় শিং। শিংওয়ালা রাজা।" লংদর্মার শিংয়ের খবর বাতাসে ভেসে-ভেসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তিব্বতের প্রজাদের মধ্যে।

লামারা আগে থাকতেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন লংদর্মার ব্যবহারে,

তার মাথার শিংয়ের কথা শুনে এবারে তাঁরা তাকে হত্যা করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু বৌদ্ধদের পক্ষে জীব হত্যা পাপ, বিশেষ করে রাজাকে। অবশেষে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে লামারা ঠিক করলেন, তাঁরা লটারি করবেন। লটারিতে যার নাম উঠবে তার উপরেই দেওয়া হবে লংদর্মাকে হত্যার অপ্রিয় কিন্তু অপরিহার্য কাজের ভার।

লটারিতে তরুণ লামা দোরজের নাম উঠল। দোরজে নির্জনে গিয়ে প্রার্থনার পরে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগল। বর্শা ও তীর ছোঁড়ায় সে দক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। দোরজে একদিন এত জোরে বর্শা ছুঁড়ল যে, একটা পাথরে লাগায় সেটা বিদীর্ণ হয়ে গেল। এই বিদীর্ণ পাথরটিকে এখনও দেখা যায় তিব্বতের 'সেরা' নামে গোম্ফায়। 'দোরজে' শব্দের অর্থ 'বজ্র'। সার্থক হল দোরজের নাম।

লামারা ঠিক করলেন, অত্যাচারী ও সন্দেহপরায়ণ রাজাকে কোনও ছুতোয় একটি বিশেষ জায়গায় এনে হত্যা করা হবে। তাঁরা একটি নৃত্য-উৎসবের আয়োজন করলেন লম্বা গাউন ও ঝোলা হাতার পোশাক পরে নাচবেন বলে লামারা ঠিক করলেন, যাতে সেই পোশাকের মধ্যে তীর-ধনুক লুকিয়ে রাখা যায়। অনেকদিন ধরে এই নাচ-গান চলল। দলে-দলে লোক এসে ভিড় করতে লাগল নাচ দেখবার জন্যে। তারপর শেষদিনে রাজা লংদর্মা এসে বসল সভাপতির আসনে। লামারা প্রথমে ধীর লয়ে নাচ শুরু করলেন। তারপর নৃত্য-গীত যখন ক্রমশ দ্রুতলয়ের দিকে, তখন দোরজে পোশাকের মধ্যে লুকনো তীর ছুঁড়ে লংদর্মাকে মেরে ফেলল।

পালাবার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। রাজাকে মারবার পরে দোরজে দৌড়ে গেল কিচ্ছু নদীর পারে। সেখানে একটি সাদা ঘোড়াকে রাখা হয়েছিল পুরোপুরি কালো রঙে ছুপিয়ে। নদীতে সাঁতার দিয়ে ঘোড়াটি দোরজেকে পিঠে নিয়ে যখন অপর পারে উঠল, তখন কালো রঙের ঘোড়া হয়ে গেল সাদা। দোরজে তার বাইরের নাচের পোশাকটি নদীতে ফেলে দিল। নদী পার হয়ে একটি গুহার মধ্যে গিয়ে ধ্যানীর ভঙ্গিতে বসে রইল দোরজে। কতকগুলি পাখি তার মাথার উপরে ফেলে দিল খড়কুটো ধুলোবালি। মনে হল, যেন অনেকদিন ধরে সে সমাধিস্থ।

রাজার রক্ষীরা পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল। তারা গুহার মধ্যে এসে নিমীলিত চক্ষু দোরজেকে দেখতে পেল পদ্মাসনে। রক্ষীদের মধ্যে একজন কিন্তু এই বাইরের রূপে না ভুলে দোরজের একখানি হাত নিয়ে তার নাড়ীর গতি দেখল, স্পন্দন দ্রুত। তারা বুঝতে পারল, এই ব্যক্তিই হত্যাকারী। রক্ষীটি বলল, "এই ব্যক্তির নাড়ীর গতিই জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে হত্যাকারী।" তারপর তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এল: রাজা লংদর্মা ছিল অত্যাচারী, অস্বাভাবিক। সে এখন মারা গেছে। তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে কী লাভ? —এই বলে তারা চলে গেল। ধরা পড়েও বেঁচে গেল দোরজে।

এর পর থেকে বৌদ্ধ লামাদের মধ্যে নাচ একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেল। লোকেরা পালন করতে লাগল অত্যাচারী রাজার মৃত্যু-উৎসব। তারপর এই অনুষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়াল সব অত্যাচারী মানুষের মৃত্যু-উৎসবের প্রতীক, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়।

হিমাচলের লাহুল স্পিতির বৌদ্ধ লামারা জুন-জুলাই মাসে নিজ নিজ গোম্ফায় বার্ষিক নৃত্য-উৎসব পালন করেন হিংস্র জন্তুর মুখোশ পরে।। হিংস্র জন্তুদের মুখোশ হল অত্যাচারীর প্রতীক—যারা সব সময়ে শুভ শক্তির কাছে পরাজিত।

বর্তমানে এই নৃত্য-উৎসবের উদ্দেশ্য অপদেবতা, শয়তান বা দুষ্ট আত্মার বিতাড়ন। এই নাচকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ডেভিল ডান্স'।

ছবি: দেবাশিস দেব

দ্যাখো কাণ্ড !
স্কাট ! স্কাট !
বেঁচে আছে ! হুঁশ ফিরছে !
কী হয়েছি, স্কাট ?
পালাও ! বারুদে আগুন ধরে যাবে ! পালাও !
ও, সেইজন্যে ওরা আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে !
ভয় নেই ! আগুন নিবে গেছে ! কিন্তু কী হয়েছিল ?
ওরা আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ! আমি বললুম, তোমাদের ফেলে যাব না !
ওরা তখন আমাকে মেরে অজ্ঞান করে রেখে চলে যায় !
বুঝেছি ! এদিকে আবার জাহাজের খোলের মধ্যে রয়েছে নিগ্রো বন্দীর দল !
বেতার-যন্ত্র মেরামত করে খবর পাঠাব ?
তাই করো । আমি এদিকটা সামলাই ।
খানিক বাদে…
আগুন পুরোপুরি নিবে গেছে !
এবারে নিগ্রো বন্দীদের খবর নেওয়া যাক !
বাঁচাও ! বাঁচাও !
মরে গেলুম !
ভয় নেই ! আসছি !
আরে, আমাকে ছেড়ে দে ! টিনটিন ! বাঁচাও !
ডাইনোসরাস ! টেরাডাকটিল ! ছেড়ে দে !
হট্ যাও ! হট্ যাও !
লড়ে যাও ক্যাপ্টেন ! আসছি !

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
বাচ্চা-গোলকিপার দু'দুটো নিশ্চিত গোল আটকে দিল
জিওফ গাইলসকে চিরশত্রু মেলবরোর কাছে বেচে দিয়ে ক্লাবের ভক্তদের নিন্দার লক্ষ্য হয়েছে রয় । রয় স্বপ্ন দেখেছিল, রোভার্সের বিরুদ্ধে জিওফ দুর্দান্ত খেলছে । বাস্তবেও তা-ই ঘটল জিওফ ইতিমধ্যেই রোভার্সকে দু'দুটো গোল দিয়েছে । তার উপরে আবার রোভার্সের গোলে আজ চার্লি নেই, তার বদলে খেলছে বাচ্চা-গোলকিপার ওয়াল্টার উইলিয়ামস । মেলবরো ফ্রি কিক পেয়েছে···
মেলবরোর খেলোয়াড়টা কী করছে দ্যাখ !
ভিক গাথরিকে ঠেলছে !
ভিক, না-রেগে বলের দিকে চোখ রাখো !
ভিক কিন্তু রেগে কাঁই ! রয়ের কথা তার কানে গেল না !
কী হচ্ছে, অ্যাঁ ?
ওই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মারো !
তার মানে রোভার্স তিন গোল খেল !
যাঃ, বল সরাসরি গোলে ঢুকছে !
উইলিয়ামস কিন্তু ইতিমধ্যে তার ডাইনে ঝাঁপ দিয়েছে ···
ননাঃ !
মাথা দিয়ে আটকে দিয়েছে !
মেলবরোর খেলোয়াড়রাও হতভম্ব !
এ-ছেলে তো ভাগ্যের জোরেই জাতীয় টিমে ঢুকবে !
কর্নার কিকটাকে কাজে লাগাও !
গোলের সামনে জটলা··· ওয়াল্টার্স কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না···
জিওফ সেই ফাঁকে হেড করল !
হ্যাটট্রিক হবে !
এ যে তাজ্জব ব্যাপার !
বাপ রে, ঠেকিয়ে দিয়েছে !

বল ধরে অ্যালান লিঞ্চ মাঝমাঠে পাঠাল ...
রয় পাচ্ছে-
পাবে, ও জানত না !
আমাকে একাই এখন ছুটতে হবে !
এই একটা সুবর্ণসুযোগ !
কীরকম দৌড়চ্ছে দ্যাখো !
গোলে মারো, রয় !
বাঁ পায়ে কামানের গোলা দেগেছে রয় !
গো-ও-ওল !
রোভার্স ১ মেলবরো ২
কিন্তু তারপরেই খেলা শেষ !
খেল খতম !
যুদ্ধের পরে আমাদের মাঠে মেলবরো এই প্রথম আমাদের হারাল
জিওফ গাইলসকে বেচে দেওয়ার ফল !
অ্যাণ্ডি জ্যাকসন ছুঁড়ে দিচ্ছে বিদ্রূপের তীর ...
বাচ্চা খেলোয়াড়কে গোলে নামাবার ফল
জিওফকে বেচার ফল !
উইলিয়ামসকে নামানো সত্যি উচিত হয়নি !
বাজে কথা বোলো না, ভিক !
শেষ দুটো বল যেভাবে ও ঠেকিয়েছে ...
তাতে বোঝা যায়, শুধু ভাগ্য নয়, ওর সাহসও আছে ! যেভাবে ও ঝাঁপিয়েছিল, তার তুলনা হয় না !
মেলবরোই আজ ভাগ্যবলে জিতেছে। আর তোমরা বড্ড আত্মসন্তোষে ভুগছিলে বলেই ভাগ্য ওদের সহায় হয়েছে।
কী বলছ রয় ?
এক ঘণ্টা বাদে ... ড্রেসিং রুমের বাইরে ...
ভিতরে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে !
PLAYERS ONLY
রোভার্স এবারে না নীচের ডিভিশনে নেমে যায়
ভাবতে পারে , এই ঝগড়াঝাঁটির পরিণাম কী হবে ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

আপনি কি...
ভালো কোয়ালিটি পাবার জন্যে বেশী দাম দিচ্ছেন?
না, বাজে কোয়ালিটি কিনছেন?

বিজ-এর সুষমতা
গ্রহণ করুন!

দামে
আগে পরিষ্কার করার পাউডার দু'রকমের হত। এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির, যার দাম চোকাতে গিয়ে পকেট খালি হয়ে যায়, আর অন্যটি একদম সস্তা কোয়ালিটির, যার দাম নিশ্চয়ই কম, তবে কোয়ালিটি...মাফ করবেন!

তারপর এলো বিজ

বিজ—দামে আর কোয়ালিটিতে এক অসাধারণ সুষমতা বজায় রাখে। আসলে বিজের দাম থেকে দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যায়, দেখুন কি করে—সুপার বিজ অন্য নামকরা পাউডারের তুলনায় ২৫% কম দামে পাওয়া যায়, আর এটি অন্য সস্তা পাউডারের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়—অথচ ফল হয় তেমনিই ঝকঝকে... ঝলমলে!

কাজে
সুপার বিজে বাড়তি ডিটারজেন্ট আছে,—যা তেলচিটেভাব সহজে, আর দাগ-ময়লা-কালি নিমেষে সাফ করে। সুপার বিজে চট্ করে ফেনা হয়, তাই অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক ভালো করে আর অনেক সহজে সাফ করতে পারে।

সুপার বিজ মসৃণ বা থরথরে সবকিছুর ওপরই সমান প্রভাবশালী। স্টীলের বাসন বা কাঁচের, কাঁটা-চামচ বা সিঙ্ক আর মেঝে—প্রায় সবকিছুই এই দিয়ে সাফ করতে পারেন। পরিষ্কার করার সমস্যা যত রকমেরই হোক না কেন, তার সমাধানের জন্যে যখন বহুপযোগী সুপার বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদা আলাদা দামী পাউডার কেনবার দরকার কি? সাশ্রয় আর কোয়ালিটি কোনোটাই হারাবেন না! বিজের দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ কাজের সুষমতা গ্রহণ করুন!

দাম কম হলে কি হয়, তেমনিই ঝকঝকে...ঝলমলে রয়!

CASGS-163-244BEN

মেজদার তিন নম্বর

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

তিন নম্বর এক্সপেরিমেন্ট। মেজদার ডজনখানেক মহৎ উদ্যম ও অসফল প্রয়াসের ক্রমিক সংখ্যানুসারে এটির নম্বর তিন।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়। মাথার ওপর দিয়ে দিনরাত জঙ্গি বিমান উড়ত। মাটির বেশ কাছাকাছি। এত কাছাকাছি যে, তার উড়ন্ত ছায়া আমাদের মাথার ওপর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে যেত। বিকট শব্দের রেশ অনেকক্ষণ ধরে কানের মধ্যে বাজত। প্রথম-প্রথম আমরা চোখ বুজে মাটিতে নুয়ে পড়তাম, যতক্ষণ না উড়োজাহাজটা দৃষ্টির বাইরে চলে যেত। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে গেল, তখন আর ভয় করত না। আমরা দিব্যি চোখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বিমানগুলির রঙ, গড়ন, নম্বর ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন লক্ষ করতাম। বলতে গেলে এই জঙ্গি বিমানগুলির সঙ্গে আমাদের একটা অপ্রত্যক্ষ পরিচয় গড়ে উঠেছিল। আর সে পরিচয় আরও নিবিড় হয়েছিল মেজদার আসবার পর। কারণ বিমানগুলির নামধাম, জাতগোত্র এমনভাবে বলত মেজদা যে, মনে হত, ওগুলি নির্মাণের সময় মেজদার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, এজন্য মেজদার কথাগুলোই আপ্তবাক্য বলে ধরে নিতাম।

আকাশে উড়োজাহাজের এই এপিডেমিক এবং মেজদার আচমকা আলটপকা প্রশ্নগুলোর মোকাবিলা করবার জন্য পুরনো একটা বুক অব নলেজ থেকে কিছু কিছু উড়োজাহাজি তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম আমি আর বিল্টু। তারপর থেকেই আমরা চেষ্টা করছিলাম উড়োজাহাজ প্রসঙ্গে মেজদাকে অনুপ্রাণিত করতে। অভিপ্রায়, মেজদার কাছে আমাদের জ্ঞানের বহর খানিকটা জাহির করা। কিন্তু কিছুতেই মেজদাকে বাগে পাওয়া গেল না। মেজদা আখড়ার চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল, কিন্তু আমাদের নাগালের মধ্যে কিছুতেই পাওয়া গেল না।

অগত্যা আমি আর বিল্টু নিজেদের মধ্যেই জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে লাগলাম।

এক-এক ধরনের উড়োজাহাজ দেখে আমি আর বিল্টু নিজেদের মধ্যে আলাচনা করতে থাকি, এটা ক্যানবেরা নাইট বম্বার, ওটা ইলেকট্রিক লাইটনিং ফাইটার অথবা হকার হান্টার ফাইটার। কিন্তু মেজদার কোনও বৈকল্য নেই। স্থাণুর মতো নির্বিকার। হাজার চেষ্টা করেও মেজদার মধ্যে উড়োজাহাজ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল না জাগাতে পেরে আমরা নিবৃত্ত হলাম।

বেশ কিছুদিন পর, হেমন্তের এক নিঝুম দুপুরে এল সেই শুভলগ্ন। বহু প্রত্যাশিত। বহু আকাঙ্ক্ষিত।

ইস্টিশানের পানিঘরের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা মারছিলাম আমরা তিনজন। বেশ ঝিরঝির বাতাস বইছিল। আকাশে তখনও ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। পিছনে অবারিত ধানের খেত। হাল্কা বাতাসে সোনালি ধান মাথা দোলাচ্ছিল। ধানচোর

ইঁদুরগুলো খেতের আলের ওপর ছোটাছুটি করছিল। আমাদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল, তখন, ঠিক তখনই মাথার ওপর দিয়ে বিরাট শব্দ তুলে উড়ে গেল একটা বিশাল উড়োজাহাজ, আর সঙ্গে-সঙ্গে, বোধকরি মেজদার মুখ ফশকে বেরিয়ে এল সেই প্রশ্নটি, যার প্রত্যাশা করে করে আমরা ক্লান্ত।

মেজদা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, বল তো, প্রথম ব্যোমযান কে আবিষ্কার করেছিলেন ?"

আমি আর বিল্টু হুটোপুটি করে এক নিশ্বাসে মুখস্থ বলার মতো বলে গেলাম, "এরোপ্লেন প্রথম আবিষ্কার করেন অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট নামে আমেরিকান ভ্রাতৃদ্বয়। এঁরা নর্থ ক্যারোলিনার পিটিহক নামক শহরের বাসিন্দে। ডেইটন, ওহিওতে এঁদের সাইকেলের দোকান ছিল। ১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর সামান্য সময়ের জন্য এঁরা উড়োজাহাজ আকাশে উড়িয়েছিলেন। পরে আঞ্জানি আঁতোয়ানেত ও লুই ব্লেরিওত নামের দু'জন ইংরেজ ১৯০৯ সালের ২৫ জুলাই উড়োজাহাজে চড়ে ৩৭ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। দূরত্ব ২৪ মাইল।"

আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের জ্ঞানের বহর দেখে মেজদা রীতিমত ঘাবড়ে যাবে। হয়তো বা পিঠ চাপড়ে বলবে, 'শাবাশ। আমার সঙ্গে থেকে তোদের বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।'

কিন্তু মেজদা তার ধারেপাশে না গিয়ে, চুপ করে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত তারপর সহসা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কক্সকম্ব কোথাকার : কী বলতে কী শোনে বলেছি, 'পার্বতী সুত লম্বোদরো' শুনলি, 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা করো'। আর জবাবও সেই রকম। হিপোক্যাম্পাস কোথাকার।"

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম, "কিছু ভুল বলেছি ?"

মেজদা বলল, "আলবত। পরীক্ষার খাতায় এই উত্তর লিখলে শূন্য পেতিস। অবশ্য তাতে আর তোদের কী আসে যায়। তোরা তো নিজেদেরই শূন্যের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিস।"

বিল্টু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। আর ধৈর্য রাখতে না পেরে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "তখন থেকে বড়া-বড়া বাত বানাচ্ছ, আরে গলতিটা কোথায় তা বলবে তো ?"

পালটা ধমক খেলে মেজদা সবসময় সিঁটিয়ে যায়, কিন্তু সে ভাবটা কাউকে জানতে দেয় না। বিল্টুর ঝাঁঝালো জবাব শুনে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে মেজদা বলল, "জিজ্ঞেস করলাম প্রথম ব্যোমযান কে আবিষ্কার করেছিলেন, তোরা এরোপ্লেন আবিষ্কারের সাতকাহন গল্প শুনিয়ে গেলি। প্রথম ব্যোমযান মানে এরোপ্লেন নয়, বেলুন। আবিষ্কার করেছিলেন সন্টগলফার নামের ফরাসি ভ্রাতৃদ্বয়, ১৭৮২ সালে। ১৭৮৩ সালের ৫ জুন তাঁরা আকাশে প্রথম বেলুন ওড়ান। তখন ব্যাগের মধ্যে গরম হাওয়া ভরে বেলুন ওড়ানো হত। তারপর হাইড্রোজেন গ্যাস এবং হিলিয়াম।"

মেজদাকে বিপাকে ফেলবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা মেজদা, প্রথম মানুষ যিনি আকাশে ওড়েন, তাঁর নাম কী ?"

মেজদা বলল, "একজন নয়, দু'জন মানুষ। নাম জাঁ ফাঁসোয়া পিলাত্রে দ্য রোজিয়ার এবং মার্কুইস দ্য আরলান্দে। ২১ নভেম্বর ১৭৮৩ সালে পনেরো মিনিটের জন্য প্যারিসের আকাশে উড়েছিলেন।"

বিল্টু অবাক হয়ে চোখ বড়-বড় করে শুনছিল। মেজদা থামতেই বলে উঠল, "আই বাপ, বেলুনকা ইতনা তাগত ?"

মেজদা বলল, "এ তোমার চার পয়সার রবারের বেলুন নয়। এর বেড় বত্রিশ ফুট।"

"আই বাপ।" বিল্টু প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।

সেই সময়ই নাকে স্মেলিংসল্ট গোঁজার মতো একটি বম্বশেল ছাড়ল মেজদা। একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা, "তোরা জেনে সুখী হবি, আমার এবারের নতুন এক্সপেরিমেন্ট, বেলুন।"

বিল্টু আঁতকে উঠে বলল, "মেজদা, ফিন এক্সপিরিমেন্ট।"

মেজদা বলল, "ঘাবড়াও মত। এবার আর কোনও খুঁত রাখব না। বেলুন আমি ওড়াবই।"

সুতরাং এবার বেলুন জোগাড়ে এবং উপকরণে কোনওটারই অভাব নেই। মেজদা যথারীতি প্ল্যান ছকে নিয়ে এল। আলকাতরা-মাখানো মোটা ব্রাউন পেপার। একটা মাটির সরা। কিছু কাটা কাপড়ের টুকরো। গঁদের আঠা এবং সুতলি দড়ি।

ব্রাউন পেপার সেঁটে বেলুনের খোল বানানো হল। তার মুখটা খোলা। সুতলি দড়ি দিয়ে মাটির সরাটা বেঁধে দেওয়া হল। এর মধ্যে কাটা কাপড়ের টুকরোতে আগুন জ্বেলে বেলুনের ভেতরের হাওয়াকে হালকা করলেই বেলুন তরতর করে আকাশে উড়বে।

সবকিছুই বেশ যত্নের সঙ্গে করা হল। আসল বৈজ্ঞানিক মেজদা। আমরা ওর দুই যোগ্য সহকারী। যেহেতু এর আগের দুটি এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে যৎপরোনাস্তি নাকাল হতে হয়েছিল, এজন্য আমি বললাম, "মেজদা, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নাও।"

মেজদা হাসিমুখে বলল, "অল অ্যারেঞ্জমেন্টস্ পারফেক্ট।" তারপর আমাদের গ্যাস দিয়ে বলল, "তোদের মতো এমন এবল্ অ্যাসিস্ট্যান্ট সঙ্গে থাকলে আমি হিমালয়ও লঙ্ঘন করতে পারি।"

বিল্টু বলল, "পহলে লঙ্কাদহনটা সেরে নাও মেজদা। হিমালয় উছলবার সময় পরে অনেক পাবে।"

একটু দমে গিয়ে মেজদা বলল, "এই বিল্টুটা এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও এনকারেজিং কথাবার্তা বলতে শিখল না।"

যাই হোক, আপাতত ঠিক হল আগামী অমাবস্যার রাতেই বেলুন ওড়ানো হবে। হনুমাথা নদীর ধারে মেজদার বাবা নিতাইজেঠু একটা ইটভাটা শুরু করেছিলেন। তার পাশেই ইটভাটার মজুরদের ঝোপড়ি। তার পাশে একটা টিলা। সেই টিলার ওপর থেকে ওড়ানো হবে বেলুন। এবং সেই বেলুনের মধ্যে থাকবে একটা মেসেজ। দেবলোকের বাণী। দেবভাষায় লেখা। ওটা লিখবে মেজদাই। কারণ সংস্কৃত ওর অপশোন্যাল সবজেক্ট।

অমাবস্যার রাতে যথারীতি টিলার ওপর জড়ো হলাম। নীচে মজুরদের বস্তিতে তখন ঢোলক বাজিয়ে গান চলছে।

বিল্টু বলল, "কী দোঁহা বানিয়েছ, পড়ে শোনাও তো মেজদা।"

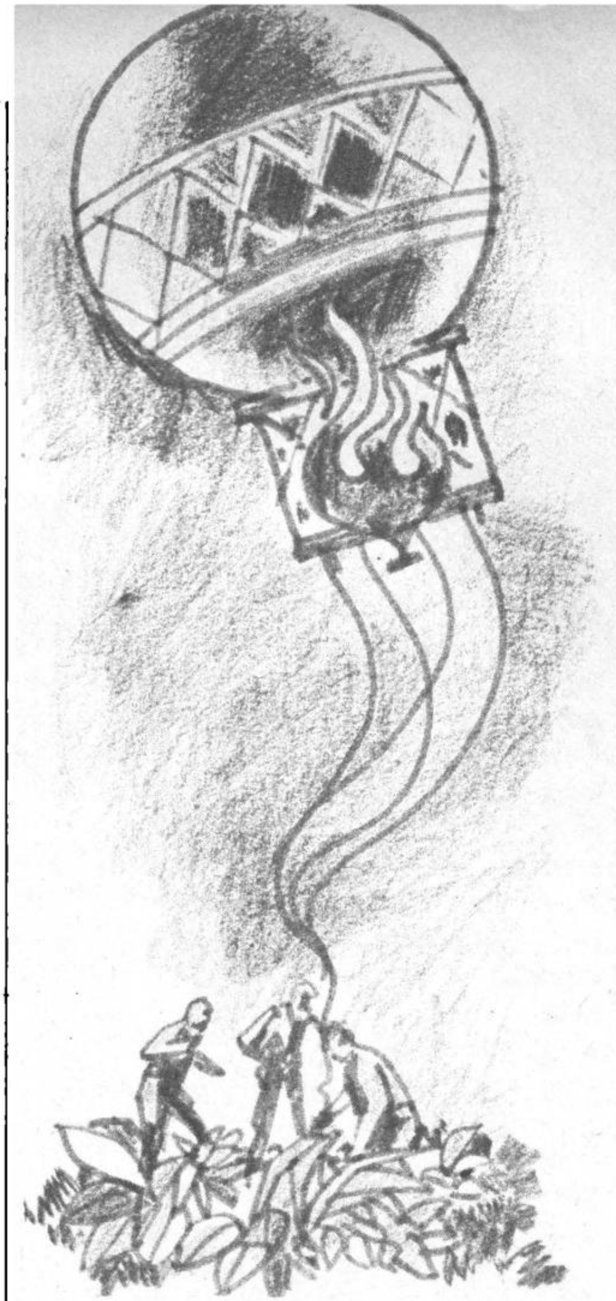

মেজদা বুঝতে না পেরে বলল, "দোঁহা, দোঁহা কী ? হোয়াট ইজ্‌ দোঁহা ?"

বিল্টু বলল, "ওই যে দেবলোকের মেসেজ না কী যেন বললে ?"

"ও, শোলোক। তা কথাটা ঠিক করে বলবি তো ! তখন থেকে দোঁহা, দোঁহা করছিস।"

বিল্টু বলল, "ওই একই হল ! যার নাম দোঁহা তারই নাম শোলোক।"

আমি টিপ্পনি কাটলাম, "যার নাম চালভাজা, তার নামই মুড়ি।"

মেজদা চটে গিয়ে বলল, "রাবিশ। যতসব গাঁইয়া ব্যাপার।" তারপর পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে আমাদের হাতে দিল। টর্চের আলোয় দেখলাম তিন লাইনের শ্লোক। লেখা আছে :

যেহি পড়িতং এহি পত্রং
সেহি যেন চলিতং যায় অন্যত্রং
নতুবা ঘটিতং বিষম্‌ অনর্থং

বিল্টু বলল, "বাঃ, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু মেজদা, মাত্র তিন লাইনের শ্লোক ? মনটা খুঁতখুঁত করছে।"

মেজদা বলল, "কোনও চিন্তা নেই। আকাশে উড়লে ঈশ্বর নিজেই চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটা পূরণ করে দেবেন।"

এই বলেই সরায় রাখা কাটা কাপড়ের টুকরোয় অগ্নিসংযোগ করল মেজদা।

কয়েক মুহূর্ত পর, বেলুন ফুলেফেঁপে উঠে তরতর করে আকাশে উড়ে গেল। আমরা তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না বেলুনটা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

মেজদা হাঁফ ছেড়ে বলল, "যাক, এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। এখন দৈববাণীর ইমপ্যাক্টটা কী হয়, দেখা যাক।"

ইমপ্যাক্ট বোঝা গেল তার পরদিনই। ইটভাটার ঝোপড়ি বেবাক খালি, মজুররা সব ঝোড়াঝুড়ি, গাঁইতি, শাবল, পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে গাঁয়ের পথে রওনা হয়েছে।

নিতাইজেঠু ছুটে এলেন। ওদের মুরুব্বিকে ডেকে বললেন, "আরে, আরে, করো কী, করো কী, রামধনি, এটা মরসুমের সময়। এ-সময় তোমরা চলে গেলে ভারী লোকসানে পড়ে যাব।"

রামধনি বলল, "কী করব হুজুর, দেওতার হুকুম। আমরা আর ওখানে থাকতে পারবনি।"

নিতাইজেঠু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "দেবতার হুকুম ? কই দেখি।"

রামধনি সেই ঐতিহাসিক দৈববাণীর চিরকুটটি নিতাইজেঠুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, কাল রাতে আকাশ থেকে একটা আগুনের গোলা নেমেছিল ওদের ঝোপড়ির ধারে। ওরা যখন দেখতে গেল, তখন একরাশ ছাইয়ের মধ্যে একটা টিনের কৌটোয় ওই দৈববাণীটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

নিতাইজেঠু চিরকুটটা পড়েই বুঝলেন এ কার কীর্তি। শ্রীহস্তাক্ষরটি নিতাইজেঠুর খুবই চেনা।

নিতাইজেঠু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "ওরে কে আছিস, একবার মেজোকে ডেকে দে তো। দৈববাণী পাঠানো হয়েছে— নতুবা, 'ঘটিতং বিষম অনর্থং'। এটা খেয়াল নেই যে, পৃষ্ঠে ঘন-ঘন পড়িতং বেত্রং।"

নিতাইজেঠু যেন অসমাপ্ত পদটা পূরণ করলেন।

ঘন-ঘন না হলেও সেদিন দু-একটা বেত পড়েছিল মেজদার পিঠে। মেজদা অবশ্য স্বীকার করেনি।

বিল্টু বলেছিল, "লেকিন, এমনটা কী করে হল মেজদা ?"

মেজদা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, "বিসমিল্লায় গলদ হয়ে গিয়েছিল। সাইট সিলেকশনটা ঠিক হয়নি। কে জানত যে বেলুনটা ঘুরেফিরে ওই ইটভাটার মজুদের ঝোপড়ির কাছেই পড়বে।"

বিল্টু মেজদাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল, "লেকিন, নিতাইজেঠু কিতনা আসানিসে চৌথা পদটা পূরণ করে দিলেন। আমরা তো কাল পরেশান হয়ে গিয়েছিলাম।"

মেজদা কটমট করে তাকিয়ে বলল, "চুপ কর। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হচ্ছে ! কক্সকম্ব কোথাকার !"

ছবি : অনুপ রায়

জানালায় মুখ

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সেবার ফুটবল টিম নিয়ে গিয়েছিলাম গোলঘাটা। ম্যাচ খেলতে।

ক্লাবের সেক্রেটারি জনার্দনদার আগ্রহই ছিল সবচেয়ে বেশি। বলেছিলেন, "চল, ওখানে মল্লিকপুরে আমার মামাদের বিরাট বাগানবাড়ি আছে। সেখানে আরাম করে দুটো দিন থাকা যাবে, গ্রাম ঘুরে দেখা যাবে।"

"বাগানবাড়ি ? সেখানে কে থাকে ?" প্রশ্ন করল বিনয়, আমাদের ক্যাপ্টেন।

"কেউ থাকে না। বাড়িতে তালা ঝুলছে। তবে মামাদের জানালে লোক দিয়ে ঝাড়পোঁছ করে রাখবে।"

"ওরে ব্বাবা," লাফিয়ে উঠল মন্টু, আমাদের সেরা প্লেয়ার, "বাগানবাড়ি, কেউ থাকে না, ও নিশ্চয়ই ভূতের আড্ডাখানা। আমি যেতে পারব না।"

"দূর পাগলা," মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন জনার্দনদা, "ভূত-টুত কিছু নেই। তা ছাড়া, ভূত কি বাড়ির মধ্যে থাকে নাকি ? ওরা থাকে গাছে। আমাদের এতজনকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে।"

"যদি ওরা সংখ্যায় বেশি হয় ?"

"এগারো জন হলে না-হয় ভূতের সঙ্গেই একটা ম্যাচ খেলব। অদ্ভুত খেলা হবে সেটা, নির্ঘাত," বলল বোঁচা।

মন্টু না গেলে আমাদের অত দূরে খেলতে যাবার কোনও মানেই হয় না. অতএব আমরা সবাই ওর ভূত-ভীতি ভাঙাবার চেষ্টা করলাম। তার ফলে ওর ভয় কতটা দূর হল জানি না, তবে ও যেতে রাজি হল। একটা শর্তে। আমাকে আর জনার্দনদাকে রাত্রে ওর পাশে শুতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা ট্রেনে করে গোবর্ধনপুর গেলাম। তারপর তিনখানা সাইকেল ভ্যানে চেপে মল্লিকপুর ঘাট। সরু, এক চিলতে নদীর ওপর নড়বড়ে, বিপজ্জনক বাঁশের সাঁকো। নদীর ওপারে মল্লিকপুর।

অত্যন্ত সন্তর্পণে সাঁকো পেরোলাম আমরা। তারপর গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে মিনিট পাঁচেক হেঁটে পৌঁছে গেলাম বাগানবাড়িতে।

বাগানবাড়ি না বলে জঙ্গলবাড়ি বলাই ভাল। চারপাশে যে গাছপালা, তাতে উদ্যান-চর্চার কোনও চিহ্ন নেই।

দিনের বেলাতেই প্যাঁচা ডেকে উঠল একটা। মন্টু ভয়ে আমার হাত চেপে ধরল।

"ভয় পাচ্ছিস কেন ? ওটা একটা প্যাঁচা," আমি বললাম।

"সেটাই তো ভয়ের," বলল মন্টু, "ভূতের বাড়িতে প্যাঁচা, বাদুড়, চাম্, ওরে ব্বাবা, এটা কী রে," লাফিয়ে উঠল মন্টু।

"একটা মথ, " আমি হেসে বললাম, "নিরীহ, গোবেচারি। ওর সঙ্গে ভূতের কোনও সম্পর্ক নেই।"

জনার্দনদার বড়মামা আমাদের আপ্যায়ন করার জন্য ঠাকুর, চাকর এবং যথেষ্ট খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা দলে ছিলাম চোদ্দ জন, জনার্দনদাকে নিয়ে। সব মিলিয়ে একটা হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। ভূত, পেত্নি, মামদো, শাঁকচুন্নি—যে যেখানে ছিল সবাই পালিয়ে গিয়েছিল কি না জানি না, তবে ডজনখানেক প্যাঁচা, সমসংখ্যক বাদুড় এবং চল্লিশ-পঞ্চাশটা পায়রাকে যে আমরা বাস্তুহারা করেছিলাম তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা জলখাবার খেয়ে আমরা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে সাইকেলভ্যানে চেপে গেলাম গোলঘাটা, ম্যাচ খেলতে।

আমাদের প্রতিপক্ষ দলটি এসেছিল পাশের গ্রাম থেকে। হেরে গেল। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে আমরা খেলার পরও

রয়ে গেলাম সেখানে কিছুক্ষণ, স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের আনন্দ বর্ধন করতে।

ওদের আনন্দ কতটা বর্ধিত হল জানি না, কিন্তু আমাদের আনন্দ উবে গেল মল্লিকপুরে ফিরে। তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে, চারদিকে জমজমাট অন্ধকার। বিদ্যুতের আলো নেই।

"সুবল, চল, এইবেলা কেটে পড়ি। আমি এই ভুতুড়ে জায়গায় টেমিলণ্ঠন জ্বালিয়ে রাত কাটাতে পারব না," বলল মন্টু।

আমি সাহস দিয়ে বললাম, "দূর বোকা! এতেই ঘাবড়ালে চলে? গ্রামে এসেছিস, গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবি না?"

"একটু সাবধানে পা ফেলবি তোরা," জনার্দনদা' বললেন, "সাপখোপ থাকতে পারে।"

স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী মানুষ আমাদের টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিল বাগানবাড়িতে।

কলকাতার চোখ ধাঁধানো বিজলিবাতির সঙ্গে আজন্মকাল যাদের পরিচয়, আজকাল অবশ্য লোডশেডিংয়ের জন্যে মোমবাতি আর লণ্ঠনের আলোতেও তাদের মানিয়ে নিতে হচ্ছে, কিন্তু গোটা রাত সেই আলোয় কাটানো তাঁদের পক্ষে এখনও কষ্টকর। ঘরের কোণে ঝুলের মতো জমে থাকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অনেকেরই গা শিউরে উঠতে লাগল। সত্যিই যদি এ-বাড়িতে ভূতপেত্নি থাকে?

জনার্দনদা বেশ সাহসী, আমিও খুব একটা ভয় পাই না। একটা বড় ঘরের মেঝেয় পাতা বিরাট শতরঞ্চির ওপর বসে বা শুয়ে সাহস জাহির করতে লাগল অনেকেই।

ক্যাপ্টেন বিনয় কথা বলতে বলতে খোলা জানালার কাছে গিয়েছিল, "ওরে ব্বাবা!" বলে চিৎকার করে তিন লাফে সে ফিরে এল।

আমরা সবাই চমকে উঠলাম।

"কী হল?"

"ভূ-ভূত! আমগাছটার তলায়।"

"ধ্যেত, যত বাজে কথা।" জনার্দনদা তার জোরালো টর্চখানা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

আলো ফেলতে দেখা গেল একটা লোককে।

"হলধর না?" হাঁক দিলের জনার্দনদা, "ওখানে কী করছিস?"

হলধর জনার্দনদার মামাবাড়ির কাজের লোক, সঙ্গেই এসেছে।

বাইরে থেকে হলধরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ইঁদারা থেকে এক বালতি জল তুলতে এসেছিলাম বাবু।"

ব্যস, আমাদের সবারই সাহসের পারদ কয়েক ইঞ্চি উঁচুতে উঠে গেল। আমরা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে পড়লাম, "এই তোর ভূত, ভিতুর ডিম! এর পর নিজের ছায়াকে দেখে ভূত বলে চেঁচাবি তুই। বলিহারি সাহস!"

"রাখ্ রাখ্," বিনয় বলল, "তোদের সাহস তো খুব দেখা গেছে।"

এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। আমরা ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলাম। এত রাতে, এই অচেনা, গা-ছমছম করা পরিবেশে কে কড়া নাড়ছে?

"কে?" জনার্দনদা চেঁচালেন।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

জনার্দনদা টর্চ জ্বেলে দরজা খুললেন। কেউ নেই।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক আলো ফেলে দেখলেন, তারপর দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন, "হাওয়া হবে হয়তো।"

"হাওয়া কি কড়া নাড়তে পারে ?" প্রশ্ন করল বোঁচা। আর ঠিক তক্ষুনি মন্টু, "সুবল, ওই দ্যাখ, জানালায়। আমি আর নেই" বলে একটা চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল শতরঞ্চির ওপর।

জানালায় দেখা গেল একটি কালো মুখ। হাসছে।

জনার্দনদাও ভড়কে গিয়েছিলেন। তিনি চেঁচালেন, "হলধর ! পঞ্চানন !"

মাথাটা নড়েচড়ে উঠতে বোঝা গেল ওর সঙ্গে ধড়ও আছে। তবে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসতে আরেকটু সময় লাগল।

"আপনারা কি নতুন এসেছেন ?" সেই মুখ থেকে স্পষ্ট শোনা গেল কথাগুলো।

"হ্যাঁ," জনার্দনদা বললেন, "তুমি কে ? এত রাতে এখানে কেন ?"

"রাত কোথায় বাবু, এ তো সবে সন্ধে। যাচ্ছিলাম নদীতে মাছ ধরতে, এখানে আলো দেখে দেখতে এলাম কারা এসেছেন।"

"তাই বলো," ক্যাপ্টেন বিনয় বলল, "তোমাকে দেখে আমরা তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম..."

খুব কাছে থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যেতেই থেমে গেল বিনয়।

"কী ভেবেছিলেন ? ভূত ? তা ভাবতে পারেন। আমাদের কাজকর্মই তো ভূতের মতন, রাত-বিরেতে," লোকটা বলল একগাল হেসে, "তবে বাবু, এ-বাড়িতে ভূত আসা-যাওয়া করে, একটু সাবধানে থাকাই ভাল।"

দূর থেকে একটা ডাক শোনা গেল, "এই মদন, চলে আয় তাড়াতাড়ি।"

লোকটা বলল, "চলি বাবু। রাতে একলা বেরোবেন না যেন। আলো নিয়ে বেরোবেন।"

সে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ আমাদের কারও মুখে কথা সরল না।

হলধর রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, "খাবার জায়গা হয়ে গেছে বাবু।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শতরঞ্চির উপর গাদাগাদি করে শুয়ে পড়লাম সবাই। ততক্ষণে আমাদের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে, কাল ভোরেই বাড়ি ছেড়ে পালাব।

জনার্দনদা বললেন, "নে, এবার ঘুমো। যত রাত জাগবি ততই ভূতের ভয় বাড়বে। দু-দুটো ভূত তো দেখলি তোরা।"

কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্য। দু-একজন আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে মটকা মেরে পড়ে রইল। আমি এবং আরও কয়েকজন গল্প করেই রাত কাটিয়ে দিলাম।

মশা ! মনে হল মল্লিকপুর গ্রামের সমস্ত মশা যেন আমাদের কামড়াবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিল। আমাদের হাতে তাদের অনেকেরই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটল বটে, তবে খালি হাতে তালি বাজিয়ে কি আর মশাবাহিনী ধ্বংস করা যায় ?

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পাততাড়ি গুটোনোর কাজ শুরু হল আমাদের। হাতমুখ ধুয়েই রওনা হলাম বাগানবাড়ি থেকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অনেকেই।

পথে একটু এগিয়েই দেখা হল মুকুন্দ সরকারের সঙ্গে। ভদ্রলোক ওই গ্রামেই বাস করেন। আগের দিন সন্ধেবেলা আমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করে বিস্তর উপকার করেছিলেন।

"কী হল, চললেন নাকি ?" বললেন সহাস্যবদন মুকুন্দবাবু।

"হ্যাঁ," জবাব দিলেন জনার্দনদা, "ছেলেরা থাকতে চাইছে না ভূত আর মশার ভয়ে।"

"মশা এখানে খুব, ঠিকই," বললেন মুকুন্দবাবু, "তবে ভূতের ভয় কেন হবে আপনারা এতগুলো লোক থাকতে ? ভূতই তো ভয়ে পালাবে।"

"আর বলবেন না। একবার আমাদেরই এক ভৃত্যকে দেখে ভূত বলে চেঁচিয়েছে, আর একবার এখানকার, কী যেন নাম ? মদনকে দেখে—"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই," মুকুন্দবাবু থামিয়ে দিলেন জনার্দনকে, "আপনারা মদনকে দেখেছেন ? মদন জেলেকে ?"

"হ্যাঁ, নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছিল। সঙ্গে বোধহয় আরও কেউ ছিল।"

"তা হলে মশাই আপনারা সত্যিই ভূত দেখেছেন। রাতদুপুরে মাছ ধরতে কেউ নদীতে যায় না। ওই মদন—"

আমরা সবাই হতভম্ব। হাঁ করে সবগুলো মুখ মুকুন্দবাবুর কথাগুলো গিলবার চেষ্টা করছে তখন। ছানাবড়া হয়ে আছে চোদ্দ-জোড়া চোখ। অস্ফুট স্বরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল মন্টু, "বলেছিলাম না ?"

"ওই মদন-জেলে এই গ্রামেই থাকত। বছর দুই আগে সাপের কামড়ে মারা গেছে। ওই বাগানবাড়িতেই," মুকুন্দ সরকার হেসে বললেন, "তা হলে মদনের এখনও বাগানবাড়ির মধ্য দিয়ে যাতায়াত আছে। আচ্ছা, যান আপনারা, নইলে ট্রেন ধরতে পারবেন না।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
এবারে ওই পাহাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর ছাল ছাড়াব !
হিহি
মার্কিন কোটিপতিরা ল্যাসোয় বেঁধে টারজানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল...
আরে, লোকটা তো বাঁধন কেটে ফেলেছে !
বেশ তো, আবার বাঁধব !
এবারে অত সহজে হবে না !
বাবা গো !
দড়ির খেলা খেলতে চেয়েছিলে ! ও-খেলা আমিও জানি !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

"তিন মামা ও এক ভাগনেকে নিয়ে এবারের ধাঁধা।" হাতের খাতাটায় আঙুল চাপা দিয়ে বন্ধ করে ছোট্‌কা আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "খুব মন দিয়ে শুনে নিয়ে লিখবে।"

কাগজ আর কলম নিয়ে আমি আগে থেকেই বসে ছিলাম। ছোট্‌কা খাতা দেখে ধাঁধাটা বলতে লাগল, আমিও শুনে-শুনে লিখে নিলাম। বেশ লাগল শুনতে। আর মনে হল, ইশ্‌, আমার যদি অমন অনেকগুলো মামা থাকত, বইমেলার এক-একটা দোকান থেকে দারুণ-দারুণ সব বই কিনতাম। তবে মামা না থাক, ছোট্‌কা আছে। এই ধাঁধাটার উত্তর করলেই যে ছোট্‌কা আমাকে নতুন একটা গল্পের বই কিনে দেবে। কথা দিয়েছে ছোট্‌কা।

ওহো, ধাঁধাটাই যে বলা হল না। সেটাই বলি বরং।

প্রথম ধাঁধা ॥ ছোট্ট হাবুলবাবু বইমেলায় এসেছে তিন মামার সঙ্গে। হাবুল নিজেও তার জমানো টাকা থেকে কিছু টাকা এনেছে পকেটে করে।

ছোটমামা প্রথমে হাবুলবাবুর পকেটের টাকাগুলো গুনলেন। তারপর নিজের পকেট থেকে গুনে-গুনে কিছু টাকা হাবুলবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার টাকাটাকে দ্বিগুণ করে দিলাম। চলো, এবার বই কিনে আনি।"

ছোটমামার হাত ধরে হাবুল ঢুকল একটা দোকানে। তিরিশ টাকার বই কিনে ফিরল। এবার মেজোমামা হাবুলবাবুর হাত ধরলেন।

মেজোমামা করলেন কী, হাবুলবাবুর পকেটে তখন যত টাকা ছিল; তার সঙ্গে নিজের কিছু টাকা মিশিয়ে বললেন, "তোমার পকেটের টাকা তিনগুণ করে দিয়েছি। এবার আমার সঙ্গে চলো, বই কিনবে।"

মেজোমামার সঙ্গে গিয়ে হাবুল খরচা করল চুয়ান্ন টাকা।

বড়মামা উঠে দাঁড়ালেন। হাবুলকে বললেন, "দেখি, পকেটে এখন কত আছে।" হাবুল দেখাল। বড়মামা সঙ্গে-সঙ্গে হাবুলের হাতে অনেকগুলো টাকা ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "তোমার যত টাকা ছিল, আমি সেটাকে চারগুণ করে দিয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে বই কিনবে চলো।"

হাবুল লাফাতে-লাফাতে চলে গেল বড়মামার সঙ্গে। বাহাত্তর টাকার বই কিনল এবার। কিন্তু পকেটের পুরো টাকা শেষ হয়নি। তখনও হাবুলবাবুর পকেটে আটচল্লিশ টাকা রয়েছে।

এবার বলো তো, মামাদের টাকা মেশাবার আগে, একেবারে শুরুতে, কত টাকা ছিল হাবুলবাবুর পকেটে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বেমানান কোন্‌টি?

রাজীব, পঙ্কজ, অরবিন্দ, প্রসূন, পুষ্কর, কোকনদ।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

কজনরনে

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৯৫টি অক্ষত ছিল, ৫টি গ্লাস ভেঙেছে। (২) তুমি কি ঘুমোচ্ছ? (৩) বাদানুবাদ।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	৫
৬		■	৭	■	৮	
৯		■		■	১০	
■	১১					■
১২	■	■		■	■	১৩
	■	১৪		১৫	■	
১৬			■	১৭		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) খেয়ামাঝি। (৩) পৃথিবীর ছাদ। (৬) শস্যবিশেষ। (৮) বিচারক। (৯) ঘুড়ি কী খায়? (১০) রাজপত্নী। (১১) মহা উৎসব। (১৪) রাতজাগা পাখি। (১৬) চোর-জোচ্চোরদের কী করা উচিত? (১৭) কোন্ প্রাণী থেকে চুন হয়?

উপর-নীচ : (১) সুকুমার রায়ের দাশু কী ছিল? (২) ঘোড়ার-গাড়িবিশেষ। (৪) আঙুলে পরো, সেতার বাজাও। (৫) রাত্রি। (৭) ভীমপুত্র। (১২) মুসলমান সম্রাট। (১৩) শৃগাল। (১৪) কাবুলি মেওয়াবিশেষ। (১৫) চাবুক।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কু	বে	র	■	ধ	নে	শ
রু	■	ফা	নু	স	■	য়
ক্ষে	ম	■	নি	■	ত্রা	তা
ত্র	■	ম	য়া	ল	■	ন
■	■	য়	■	লা	■	■
সা	র	দা	■	টি	কা	রা
ম	দ	ন	■	কা	গ	জ

রঞ্জন

মজার খেলা

তেরোটা পোড়া দেশলাইকাঠি আর ছ'টা লুডোর ঘুঁটি লাগবে এবারের খেলার জন্যে। ঘুঁটিগুলো একই রঙের ছ'টা পেলে তো কথাই নেই।

কাঠিগুলো দিয়ে নীচের ছবির মতো খাঁচা বানাও টেবিলের উপরে, আর, তার মধ্যে, যেমন দেখানো আছে সেভাবে, ঘুঁটিগুলো রেখে দাও।

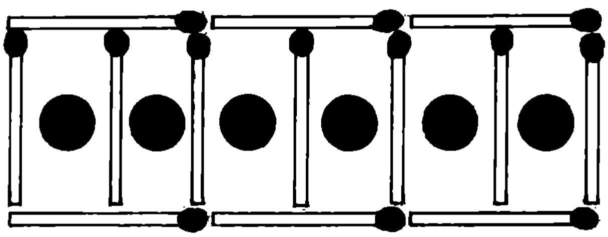

এবার বন্ধুদের ডাকো।

তাদের বলো, তেরোটা কাঠি দিয়ে এই খাঁচাটা বানানো হয়েছে। ছ'টা ঘুঁটি আসলে ছ'টা জন্তু। সেই ছ'টা জন্তু রয়েছে এই খাঁচার ভিতরে। প্রত্যেকের আলাদা ঘর। এই খাঁচাটার একটা কাঠি সরালেই জন্তুগুলোর আলাদা-আলাদা ঘর থাকছে না আর। হয় অন্য ঘরে চলে যাবে, নয় রাস্তায়।

কিন্তু সত্যিই একটা কাঠি যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে ছ'টা জন্তুকে ছ'টা ঘরে রাখা কি সম্ভব ? যদি সম্ভব হয়, তা হলে কীভাবে সম্ভব, সেটা বন্ধুদের করে দেখাতে হবে।

নিশ্চিন্ত থাকো, বন্ধুরা পারবে না। তোমাকেই উত্তর করে দেখাতে হবে তখন। আর তাই, বারোটা কাঠি নিয়ে কীভাবে ছ'টা জন্তুর জন্যে ছ'টা আলাদা ঘর তৈরি করতে হয়, সেই কায়দাটা শিখেই নাও।

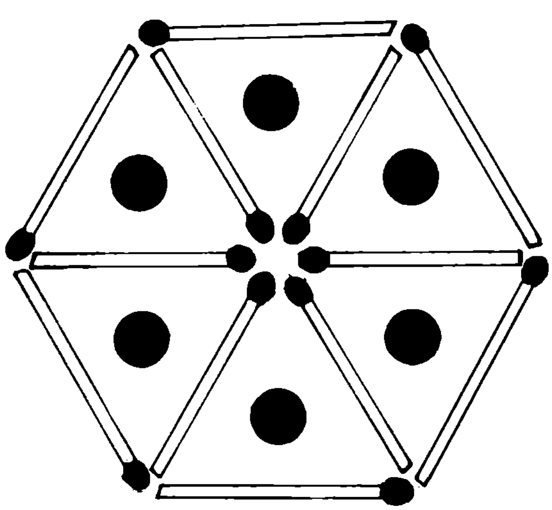

কী, হল তো ?

মজারু

হাসিখুশি

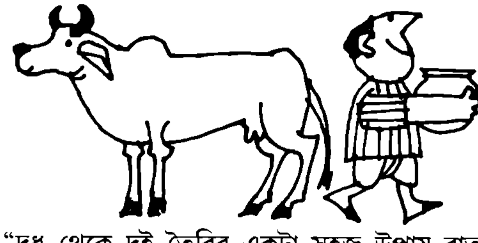

"দুধ থেকে দই তৈরির একটা সহজ উপায় বাতলে দিন তো রাখহরিবাবু !"

"খুব সোজা উপায় আছে। গোরুকে একটু তেঁতুল খাইয়ে দিন, ব্যাস্।"

"এই যে কণ্ডাক্টরভাই, আপনাকে বলেছিলাম না উলটোডাঙায় নামিয়ে দিতে ? এ তো দেখছি দমদম চলে এল !"

"ওঃ তাই বলুন, এখন বুঝতে পারছি, যাঁকে উলটোডাঙায় নামিয়ে দিলাম জোর করে, তিনি কেন নামতে চাইছিলেন না !"

"বদুকাকু, দেওঘর জায়গাটা কোথায় ?"

"ঠিক জানি না রে।"

"আচ্ছা ওড়িশার রাজধানীটা কোথায় বলতে পারো ?"

"দুস্, এসব মনে থাকে ! সেই কবে পড়েছি।"

"ও বুঝেছি। এত কথা জিজ্ঞেস করেছি বলে তুমি রাগ করেছ।"

"না রে পাগলা, রাগ করব কেন ? এত জিজ্ঞেস না করলে তুই সব জানবি কী করে ?"

"দূরের কোনও জায়গায় বেড়াতে গেছ। জানতে পারলে, উত্তর দিক থেকে দুশো মাইল বেগে ঝড় আসছে। তখন কী করবে তোচন ?"

"আগে উত্তর দিক কোন্‌টা জেনে নেব।"

"যাঁরা যুক্তিপূর্ণ কথা বলেন, তাঁদের কী বলে বলো তো তাতান ?"

"প্রযুক্তিবিদ স্যার।"

"এ-বছর প্রায় কুড়িজনকে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দিতে হয়েছে। সামনের বছর এদের হাত থেকে বাঁচার একটা উপায় বাতলে দিতে পারো ?"

"চাঁদা চাইতে এলেই 'সরস্বতী' বানান করতে বলবে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ঝাল ঝাল লঙ্কা আর টকমিষ্টি টমেটোর মিশ্রণ।

এবং তখন-ই দারুণ সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস। এতে সব কিছুই আছে — মুখে জল আনার মতো ঝাল ঝাল স্বাদ যা আপনার রসনাকে তৃপ্তি দেবে আর এর সব-টুকুই আপনার চেটে-পুটে খেতে ইচ্ছে কর'বে।

একাধারে ঝাল ঝাল স্যসের স্বাদ

লালচে টমেটোর রসের সঙ্গে ঝাল ঝাল লঙ্কা মিশিয়ে তার ওপর খানিকটা গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। কিসানের স্যস তৈরীর অনন্য অভিজ্ঞতা আর কারিগরী ক্ষমতা থাকায় এই অপূর্ব স্বাদ সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না।

প্রথম স্বাদেই একেবারে কাৎ

অরুচি দূর ক'রতে আপনার মুখ বদলান। আপনার মনের মতো সব খাবারগুলোতেই কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস মিশিয়ে নিন। খেতে ব'সে দেখবেন এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

আর দ্বিধা ক'রবেন না। কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস চেখে দেখুন! অন্য কোন স্যস আপনার পছন্দ মতো খাবারকে বা যে কোন খাবারকে এত সুস্বাদু এবং রুচিকর ক'রে তোলে না।

আজ থেকেই শুরু ক'রুন। এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

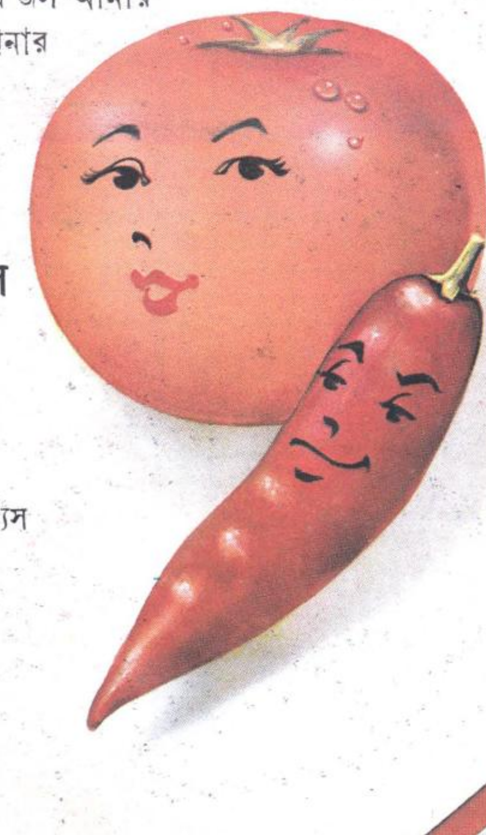

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যসে
এই স্যসের কোন বিকল্প নেই।

OBM 2004 Ben

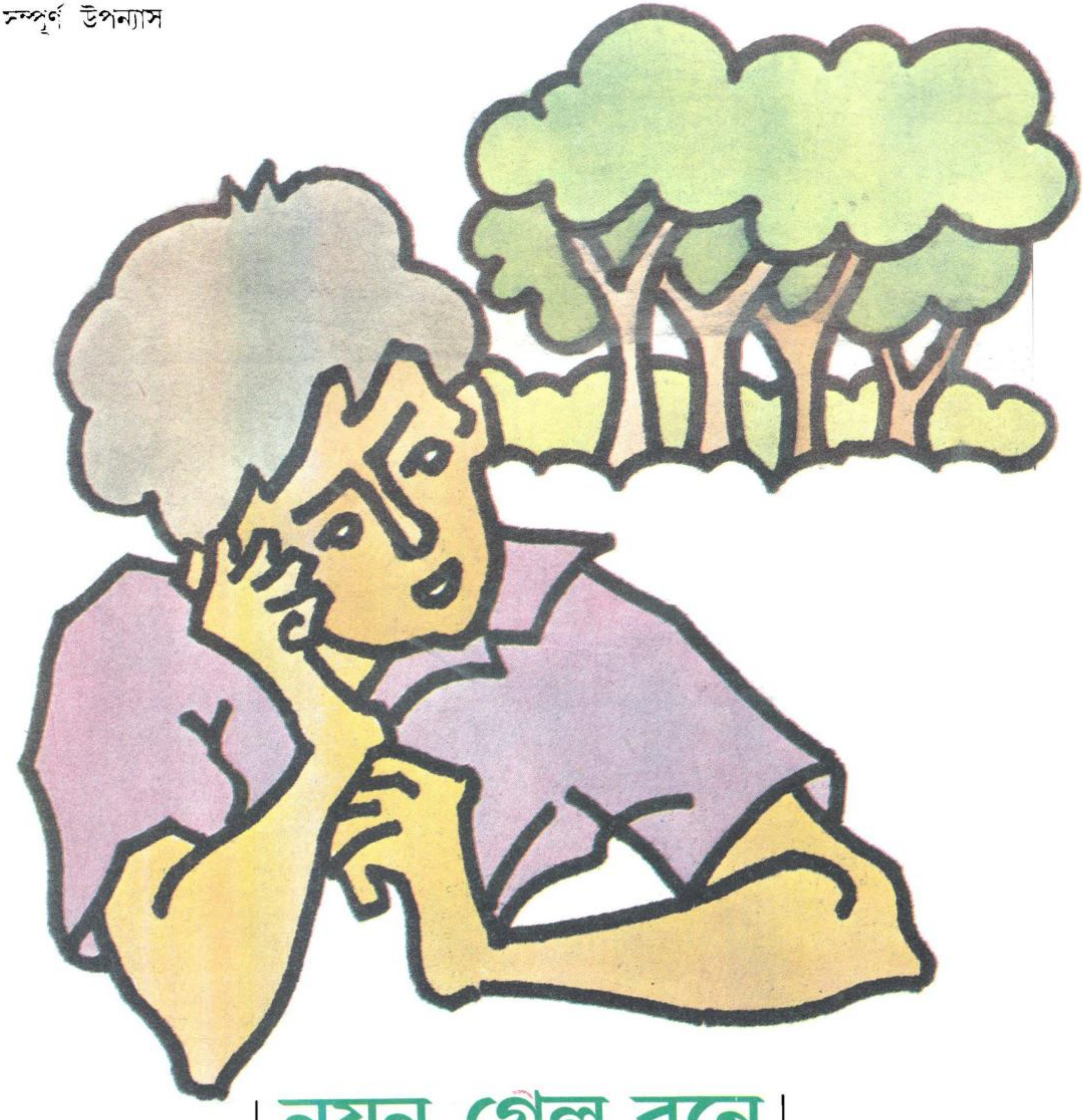

নয়ন গেল বনে

নিখিলচন্দ্র সরকার

বাবা গেল বনে। মধু আনতে। নয়ন হাঁ করে পথের দিকে চেয়ে থাকে। বাবা তো আর ফেরে না! একদিন যায়, দু'দিন যায়, এমনি করে পাঁচ-পাঁচটা দিন চলে গেল। তবু তার বাবার ফেরার নাম নেই। নয়নের ভারী মন খারাপ হয়। তার কিচ্ছু ভাল লাগে না। ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না। পড়ায় মন বসে না। খাওয়ার বায়না নেই। ঘুসঘুসে জ্বরের মতন মনের ভেতরে শুধু বাবা কেন ফেরে না, ফেরে না, এই এক ভাবনা। বাবা যে তাকে কানে কানে বলে গেছে, বন থেকে এবার ঢের ঢের মধু আনবে। বেশ মজা হবে তা হলে। অনেকদিন আর

বনে যাবে না তার বাবা। এই একটা কথাই রোদের তাপ হয়ে তার চোখের জল শুষে নিয়েছিল। মুখে ঝকঝকে হাসি ফুটেছিল। মেঘ সরিয়ে সোনা-সোনা রোদ বুঝি উঁকি মারে।

এটা শুধু একবারই নয়, প্রতিবারেই এই এক ছবি। বাবার বনে যাওয়ার সময় এলেই নয়নের চোখে জল আসে। কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসায়। দেখতে দেখতে চোখ করমচার মতন রাঙা-টুকটুক। বাপকে ছেড়ে থাকতে তার যে ভীষণ দুঃখ। মন মানে না। খালি ফোঁপায়। বাবার চোখেও তখন মেঘলা দিনের ছায়া জমে। বাবা তাকে কোলে তুলে নেয়। আদর করে। কত কী বলে। সব কথার মানেও সে বোঝে না। দরকারও নেই বোঝার। কানের কাছে একটা কথাই শুধু ভোমরার মতন গুনগুন করে, বড় গরিব তারা। বনে না গেলে তারা খাবে কী, বাঁচবে কী করে। বাবা বলে, বনই তাদের মা-বাপ। খাওয়া-পরার মালিক। বনের দেবী বনবিবির কত দয়া। হ্যাঁ, নয়নও দেখেছে, বনে যাওয়ার আগে বনবিবির পুজো দেয় সবাই। তিনিই বিপদ-আপদ থেকে বাঁচান। তাঁর দয়াতেই তো নৌকো বোঝাই করে কাঠ গোলপাতা মাছ মধু, আরও কত কী নিয়ে ফিরে আসে ভিন-ভিন গাঁয়ের লোক। তার বাবাও বন থেকে টিনভরা মধু আনে। কাঠ আনে, পাখির মাংস আনে। তারপর বাবা চলে যায় গঞ্জে। একবার হরিণের মাংসও এনেছিল। তখন ঘরের চেহারাই যায় বদলে। মা'র মুখে হাসি ঝরে। বুকের ধড়াস-ধড়াস মিলিয়ে যায়।

বন থেকে ফিরে এলে নয়ন বাবার গলা জড়িয়ে ধরে। বুকের ভেতরে খুশির জোয়ার। পলকে সব দুঃখ, মন-কেমন-কেমন ভোঁ ভোঁ। কত গপ্পো তখন। গাছগাছালির, পশু, পাখি, নদী-খাল-বিলের কত কথা, নয়ন চোখ বড়-বড় করে শোনে, সব শোনে। কুমির কামট বাঘ ভূতপ্রেতের কথা। গাঁয়ের লোক বাঘকে বলে বড়মামা। কেউ ডাকে বড়মিঞা। কেউ বা দক্ষিণ রায়। বাঘ যে বনবিবির বাহন। মান্যি না করলে চলে! তারপর আরও কত দত্যি-দানোর গপ্পো। কত পাড় বন্ধ, গুঁড়িবন্ধ, কত কালাসের সাজন বা মন্তর-তন্তর। তার বাপ যে সাঁয়দার! বনের ভেতরে কত রকমের সব জাদু। কত মায়াজাল পাতা। যারা যায়, সবাই কি আর ফিরে আসে! কেউ কেউ তো আর ফেরেই না। বনই তাদের রেখে দেয়। তাদের ঘরে-ঘরে তখন কান্নার রোল। বুকফাটা হাহাকার। বাবা বলে, কত অশরীরী আত্মা খালে বিলে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফিসফিসিয়ে ডাকে। মাঝে-মাঝে তেনাদের দেখা মেলে। পথ আগলে দাঁড়ায়। তখন বনবিবি, গাজিসাহেবের নাম স্মরণ করে তারা। বাইশ ফকিরের নাম নেয়। বিড়বিড় করে মন্তর আওড়ায়। তেনারা সরে যান। তার বাপ একটার পর একটা গপ্পো বলে যায়। নয়নের গায়ে কাঁটা দেয়। চোখের সামনে কত কী ভেসে ভেসে চলে। বনের কথা শুনতে-শুনতে তার চোখে ঢুলুনি নামে। চোখের পাতায় ঘুম-ঘুম ভাব। তাকাতে পারে না। তারপর গভীর, গভীর ঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হরেক স্বপ্ন দেখে নয়ন। ঘুম ভাঙলে তারও বনে যাওয়ার লোভ হয়। কিন্তু যাবে কী করে। সে তো পথঘাট চেনে না। সে যে এখনও কত ছোট।

এমনি করে আরও ক'দিন কাটল। বাবা আর ফেরে না। মনও মানে না। খালি আনচান। বুকের মধ্যে কান্নার মেঘ। দিন যায়। রাত হয়। আবার দিন। তারপর সবাই একদিন ফিরে এল। ফিরল না শুধু তার বাবা। বনমালী-খুড়ো চুপ-চুপ করে কী যে এসে বলল মা'র কানে-কানে, তা শুনে মা'র চোখে আঁধার নামল। বুকের ভেতরে সাত সমুদ্দুরের উথাল-পাথাল। চোখের জলে বুক ভাসল। মা শুধু কাঁদে আর কাঁদে। কিন্তু গলা ফাটিয়ে কাঁদতে পারে না। মনের দুঃখ মনেই পাথর হয়ে থাকে। একসময় চোখের জল চোখেই শুকোয়। চুপচাপ কী ভাবে আর ভাবে। মা বলে, বনবিবির কোপ পড়েছে তাদের ওপর। কিন্তু কেন? যাওয়ার সময় কি পথের পাশে অপয়া কোনও ভেড়া বা অলক্ষুনে ছাগল দেখেছিল তার বাবা? মালসারার মন্তরের কি কোনও ভুল করেছিল! কে জানে!

নয়ন বোবা হয়ে গেল। মা'র মুখের দিকে তাকালে তার বুকে মেঘ ডাকে। সেই ডাকে দুঃখের সাগর উথলে ওঠে। চোখ ফেটে জলের ধারা নামে। সে ভেবে পায় না, বনমালী-খুড়ো মা'কে কী এমন কথা বলল! তারপর থেকেই মা যেন কীরকম। কাজে মন বসে না। খাওয়ার ঠিক থাকে না। মা'কে সে প্রশ্ন করে, 'মা, বলো না মা, বাবা কেন ফিরল না?'

মা'র চোখ ছলছল। ঠোঁট কাঁপে থরথর। শাড়ির আঁচলে মুখ ঢাকে মা। চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'তোর বাপ আর কোনওদিন ফিরবে না রে নয়ন, আর ফিরবে না!'

'কেন?' চমকে ওঠে নয়ন। চোখের কোলে জমাটবাঁধা গভীর দুঃখ।

'তোর বাপকে যে বনবিবি নিয়েছেন রে। বনবিবি যাকে একবার নেন, সে আর ফেরে না নয়ন।'

নয়নও ডুকরে ওঠে। না, না, এসব কথায় তার মন সায় দেয় না। বিশ্বাস হয় না। তার বাবা যে নামকরা বাওলে। কত মন্তর-তন্তর জানে। জঙ্গলের বেড় কেটে একদিন-না-একদিন তার বাবা আবার ফিরে আসবে। সে তখনও বাবার ফেরার অপেক্ষায় সময় গোনে। পথের দিকে ঠায় চেয়ে থাকে। বাবার কথা ভেবে ভেবে তার চোখে ঘুম আসে না। ছটফট করে।

সময় তো আর এক জায়গায় থেমে থাকে না। দিন গেল। মাস ফুরোল, বছর ঘুরল। তারপর সব একদিন থিতিয়ে এল। তার বাবা আর ফিরল না। মা গেল মহাজনের ঘরে কাজ করতে। মা'র শরীর ভাঙল। সুখ গেল। দিন-দিনই ঘরের অভাব বাড়ল। এত খেটেখুটেও তাদের অভাব যায় না। মা'র পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি। তার গায়েও ফাটাছেঁড়া প্যান্ট-শার্ট। বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা থাকলে কি আর এমন দশা হয় তাদের।

নয়নও ব্যাজার মনে পাঠশালায় যায়। পড়ায় মন বসে না। আকাশপাতাল কত কী ভাবে। ঘরে মন টেঁকে না তার। মা যায় সেই কোন্ সকালে। ফেরে রাত করে। ঘর খাঁ-খাঁ। অনাথ ছেলের মতন এখানে-ওখানে একা একা সে ঘুরে বেড়ায়। গাঁয়ের প্রান্তে বনবিবির থান। গাছগাছালিতে ঘেরা। সন্ধের পর এদিকে কেউ আসে না। কোনও-কোনওদিন বনবিবির থানে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকে নয়ন। চোখের জল ফেলে। এখানেই গাঁয়ের লোক এসে পুজো দেয়। দিনক্ষণ দেখে নৌকো ভাসায়। তার বাবাও তো এখানে কতবার এসেছে। এক-এক করে কত কথা মনে পড়ে। বাবার

শোক এখনও তার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। সন্ধে হয়। অন্ধকার জমে। রাত বাড়ে। ঝিঁঝিপোকা তারস্বরে ডাকে। এলোপাতাড়ি হাওয়া ছোটাছুটি করে। নয়ন তখনও বসেই থাকে। তার ভয়ডর নেই। মনে-মনে কত জল্পনা-কল্পনা! সেও একদিন বনে যাবে। তার চোখে তখন আগুনের ঝিলিক। প্রতিশোধ, বাপকে মারার প্রতিশোধ সে নেবেই। বাতাসে কারা তখন শিস দেয়। কানের কাছে ফিসফিস করে। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে নয়ন। কারা যেন তাকে বলে, আর দেরি নয় নয়ন, দেরি নয়। এবার একদিন মা-বনবিবির নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তোমার বাবার প্রতিশোধ নেবে না? বুকের ভেতরে দপদপ করে ওঠে। সে মনে-মনে তৈরি হয়। কেন, কেন তার বাবাকে তারা মারল! বাবা থাকলে তো আর তাদের এত দুঃখ, অভাব থাকত না। মা'র এখন কত কষ্ট। খাটতে খাটতে গায়ের রঙ কালি-বরন। ঘোলাটে চোখ। নয়ন উঠে পড়ে। ঘরের পথ ধরে।

এমনি করে দিন যায়। নয়নও বসে থাকে না। লুকিয়ে লুকিয়ে সে তীর-ধনুক বানাল। হাতের নিশানা ঠিক করল। চোখের দৃষ্টি ধারালো হল। বাপের ডিঙিনৌকোটা সে ঠিকঠাক করল। ডিঙিটার দিকে তাকালে তার বুক ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে। এই ডিঙি নিয়েই না বাবা বনে যেত! হাটে, গঞ্জে! এখন সেই ডিঙিটাই ঘরের কাছে পড়ে থাকে মাসের পর মাস। বনমালী-খুড়ো ডিঙিটা কিনতে এসেছিল একদিন। মা তাকে ফিরিয়ে দিল। এই ডিঙিটা ছিল বাবার প্রাণ। কত আদর করত। কত যত্ন। জঙ্গল করতে যাওয়ার আগে এরও পুজো দিত। বাবা বলত, এই ডিঙিতে থাকলে কোনও ভয় নেই। তেনাদের কেউ এই ডিঙি ছুঁতে পারবে না, কোনও অপকার করতে পারবে না। এটা হল মন্ত্রসিদ্ধ ডিঙি। নয়ন ছটফট করে। ঘরে আর মন বসে না। দূরের বন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

তারপর একদিন সেই সময় এল। বনবিবির নাম নিয়ে নয়ন তো নৌকো ভাসাল। কাঁধে তার তীর-ধনুক। কিন্তু পথ তো চেনে না সে। নয়ন পড়ল দ্বিধায়। নদীর নাম মাতলা। শান্ত নরম গলায় সে জিজ্ঞেস করল, "মাতলাদিদি, আমার বাবা কোন্ পথে গেছে বলো না।"

মাতলাদিদি কলকল করে হাসল। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝঙ্কার উঠল। বলল, "তুমি কে?"

"আমি নয়ন।"

"কী হয়েছে তোমার বাবার?"

"আমার বাবা গিয়েছিল বনে মধু আনতে, আর ফিরল না।"

"আহা রে," মাতলাদিদির গলায় মমতা ঝরল। সস্নেহে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমার বাবা, কোন্ গাঁয়ে তোমাদের ঘর নয়ন?"

"ভরতগড় গাঁয়ের সুবল বাওলেকে তুমি চেনো না মাতলাদিদি! মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। টান-টান চোখ। গলায় কণ্ঠি। হাতে মাদুলি!"

মাতলাদিদি ভুরু কুঁচকে কী একটা মনে করার চেষ্টা করল। তারপর মিষ্টি করে হাসল। হেসে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। বছর-দুই আগে এই পথেই গিয়েছিল তোমার

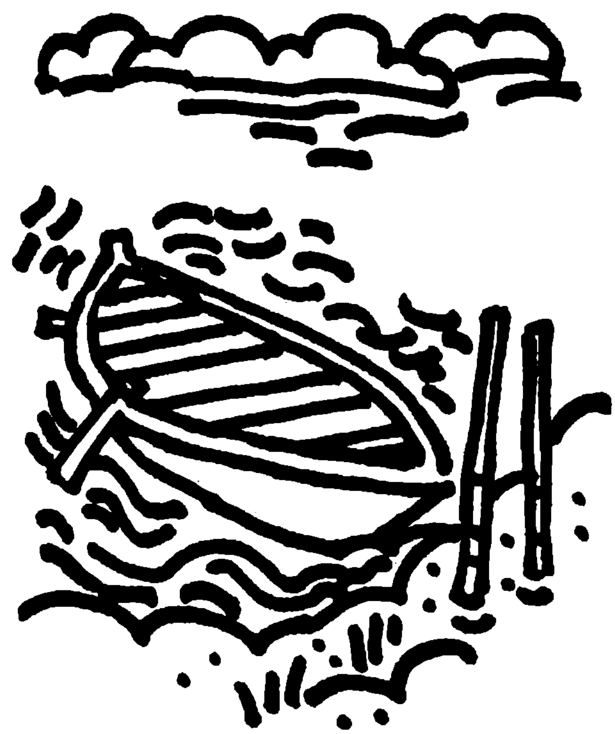

বাবা। চিনেছি, চিনেছি, এই তো সেই ডিঙি।"

নয়ন উৎসাহ বোধ করল। নড়েচড়ে বসল। গলায় কাকুতি, "তুমি আমাকে সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো না মাতলাদিদি!"

"সে তো অনেক, অনেক দূর। বড় ভয়ের জায়গা নয়ন, তুমি বরং ঘরে ফিরে যাও।"

"না মাতলাদিদি, প্রতিশোধ না নিয়ে আমি আর ঘরে ফিরব না।"

"প্রতিশোধ, কিসের প্রতিশোধ নয়ন?"

"ওই যে, আমার বাবাকে যে মেরেছে তার।"

"তা হলেই কি তোমার বাবা ফিরে আসবে নয়ন?"

"না মাতলাদিদি, আমার বাবা আর ফিরবে না।"

"তবে?"

"কিন্তু এর একটা বিহিত তো চাই। আমাকে আর ঘরে ফিরতে বোলো না তোমরা।"

"ঘরে তোমার মা রয়েছে, তোমার জন্যে কত ভাবছে বলো তো!"

"মা'র জন্যেই তো আরও দুঃখ আমার।"

"বুঝেছি।"

"আমার সব কথাই তো শুনলে, এবার আমার সহায় হও।"

"বেশ, তাই হলাম। এখন থেকে কেউ আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তোমার, তবে একটা শর্ত আছে নয়ন।"

"কী শর্ত?" চোখ টান-টান করে তাকায় নয়ন।

"কাঁধে তোমার তীর-ধনুক, ভুল করেও কাউকে তুমি অকারণে মারতে চেয়ো না।"

"তা কেন, আমার তো কারও ওপর রাগ নেই মাতলাদিদি, শুধু, আমার বাবাকে যে মেরেছে, এই তীর-ধনুক তার জন্যেই।"

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো
তোমার খেলাঘর!"— ফেভি ফেয়ারী

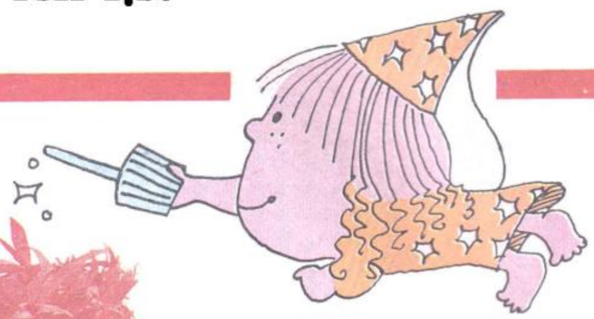

চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল এম-আর।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি--বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়।
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল এম-আর।

বিনামূল্যে জাপানী ফুলগুলো এবং ক্রিসানথেমাম কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান অথবা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

বিনামূল্যে জাপানী ফুলগুলো এবং ক্রিসানথেমাম কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

নাম: ____________________

বয়স: ____________________

ঠিকানা: ____________________

____

শহর: ____________________

রাজ্য: __________ পিনকোড: __________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফট্‌ পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ/না (A)

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহেসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি আর ফেভিকল ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-7070 BN

তারপর কত কথা। কথার শেষ নেই। ওরা এগিয়েই চলে। মাথার ওপর সূয্যিঠাকুর। মুঠো-মুঠো রোদ ঝরে পড়ছে। আকাশ ফিকে লাল। মেঘের টুকরো ভেসে ভেসে চলে। আলোছায়ার খেলা। হুটোপাটি করে বাতাস এসে গায়ে পড়ে। মাতলাদিদির হাতের কাঁকন বাজে রিনঝিন, রিনঝিন। একসময় মাতলাদিদি বলল, "আমার এখানেই শেষ নয়ন। আমি এখন সোজা আরও দক্ষিণে চলে যাব। সেখানে সপ্তমুখীতে গিয়ে মিশব। তুমি বাঁ দিকের পথ ধরবে। এবার হোগলডুরি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ওকে সব বলে দিয়েছি। আমরা তোমাকে সবাই মিলে রক্ষা করব নয়ন। কোনও ভূত-প্রেত তোমাকে ছুঁতে পারবে না। কোনও হিংসুটে, লোভী, বদমেজাজি জন্তু-জানোয়ার তোমাকে খেতে পারবে না। তুমি আমাদের ছোট্ট সোনাভাই। তোমার কথা ভুলব না নয়ন, ভুলব না। বলতে বলতে মাতলাদিদির গলা ধরে এল। চোখ ছলছল।

কষ্ট নয়নেরও, উদাস, ফ্যালফ্যালে চোখে সে চেয়ে থাকে। মাতলাদিদি কখন চলে গেছে। ডিঙির গায়ে হাওয়া লেগেছে। শাঁইশাঁই করে ছুটছে। ওকে মনমরা দেখে হোগলডুরি মুচকি হেসে শুধোল, "বাপকে বুঝি খুব মনে পড়ছে নয়ন ?"

বাবার কথায় নয়নের চোখ চকমক করে উঠল। তার বাবা যে কত নামকরা লোক ! কত বড় বাওলে। মন্তরের জোরে ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারত না তার। বাঘ লেজ গুটিয়ে সুড়সুড় করে পালাত। বেশ হত। হরিণ সামনে পড়লে আর যেতে পারত না। সাপ ফণা নামিয়ে মুখ লুকোত ঝোপেঝাড়ে। ভূতপ্রেত বশ মানত। কুমির-কামট কথা শুনত। মা'র কাছে বাবার এরকম কত গপ্পো যে সে শুনত ! শুনতে শুনতে বুক ফুলে ফুলে উঠত। সেই বাবা গেল একদিন বনে। আর ফিরে এল না ! বাবার শোকে এখনও নয়ন কাঁদে। হঠাৎ হঠাৎ ঘুম থেকে সে জেগে ওঠে। বাবার কথা তার মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে। হোগলডুরিকে সে বলে, "আমার বাবাকে তুমি চিনতে ?'

"চিনতাম নয়ন,মাতলা আমায় কানে কানে সব বলেছে।"

"কিন্তু পথ যে আর ফুরোয় না দিদি !"

"এ কি একদিনের পথ ! তাও পবনভাই সঙ্গে আছে, তাই দু'দিনের পথ একদিনেই চলে এসেছ। এভাবে চলতে থাকলেও কম করে আরও দু'দিন তো লাগবেই ভাই।"

"আরও দু'দিন !" নয়ন চমকে ওঠে।

"হ্যাঁ নয়ন, তোমার বাবা যে এবার অনেক দূরে গিয়েছিল।"

নয়ন চুপ করে থাকে। মনের মধ্যে কত কথা বুজকুড়ি কাটে। মধু আনতে এত কষ্ট করত তার বাবা। বাবা কি খেতখামারে কাজ পেত না। মা বলত, গোলাবাড়ির হরিপদ সাউ হল এক মহাজন। সেই মহাজনের ঘরে বাঁধা পড়েছে তার বাবা। সহজে কেউ সেখান থেকে ছাড়া পায় না। বাঁধন বড় শক্ত। বাঁধন কাটানোর জন্যে চাই টাকা। তার বাবা যেখানে গেল, সেখানে কি ঢের ঢের মধু মেলে ? নয়ন ফের প্রশ্ন করে, "তুমি কি বলতে পারো হোগলডুরি-দিদি, আমার বাবা অতদূর কেন গিয়েছিল ?'

"পারি নয়ন, পারি। বাবা তোমার লোভে পড়েছিল তাই। জানত না, ওখান থেকে ফেরা খুব কঠিন।"

কথা বলতে বলতে ওরা অনেকটা পথ চলে এসেছে। একসময় হোগলডুরি বলল, "এবার করতাল তোমাকে পথ দেখাবে। আমি এখন যাই নয়ন। আবার দেখা হবে।"

করতাল ছোট্ট নদী। ওকে সে আদর করে টেনে নিল, "এসো ভাই নয়ন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। মন খারাপ কোরো না। আমরা তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।"

নয়ন চারদিকে তাকায়। বিভোর হয়। হুহু করে বাতাস বইছে। তীরের মতন ডিঙি ছুটছে। একটার পর একটা গ্রাম পেছনে পড়ছে। ছোট ছোট ঘরবাড়ি, খেত, জলাভূমি, ঘাস, গাছগাছালি চোখে পড়ছে। কত পাখি। ঝিলের ধারে লাল মুনিয়া। ঝোপেঝাড়ে বাবুনাই। শালিখ, ফিঙে, পাঁশফুটকি, দোয়েল। নয়নকে দেখে মৌচুসিরা ছুটে এল। এল আরও অনেকেই। টুনটুনি, কালীশ্যামা,এমনি আরও কত সব পাখি। ফুলচুসি বলল, "তোমাকে তো এই সাজে আমরা আর কক্ষনো দেখিনি। কোথায় যাও গো নয়নদাদা ?"

"সে ভাই অনেক কথা। বাবা গিয়েছিল জঙ্গলে, আর ফিরল না। আমি যাই তার তালাস করতে।"

লালমুনিয়া লেজ নাড়ল, "আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।"

দোয়েল শিস দিল, "আমরা তোমাকে পাহারা দেব।"

চশমা-পাখি মিষ্টি সুরে অভয় দিল, "বিপদ এলে আগে থাকতেই তোমায় আমরা খবর দেব।"

মৌচুসি এগিয়ে এল নাচতে নাচতে, "আমরা তোমাকে মধু খেতে দেব।"

নয়নের খুশি আর ধরে না। বুকে ফুটল ভালবাসার ফুল। চোখে লাগল রামধনুর রঙ। খানিক পরে বলল, "তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে ভাই।" আবার কী মনে পড়ল নয়নের। বলল, "কালীশ্যামা, কালীশ্যামা, তোমরা আমার মা'কে একটু দেখো। আমাকে ছেড়ে মা তো কখনও একলা

থাকেনি ! মা'র বড় কষ্ট ।" তারপর টুনটুনিকে বলল, "টুনটুনি গো টুনটুনি, মাকে তোমরা বোলো, তোমার ছেলে গেছে বনে, বাবার খোঁজে। সময় হলেই ফিরবে ।" ডাহুকের দিকে চোখ ফেরাল নয়ন, "ডাহুকভাই, ডাহুকভাই, মা'কে তোমরা বুঝিও, তার নয়নের জন্যে যেন চোখের জল না ফেলে, মন না খারাপ করে, মাকে বোলো, তা'র ছেলের সহায় মাতলাদিদি হোগলডুরি, আরও কত নদী খাল খাঁড়ি, তার সহায় পবন, তার সহায় তোমরা ।"

ওরা দুঃখ পেল । মন খারাপ হল । আরও অনেকটা পথ তারা নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এল । নয়ন বলল, "এবার তোমরা ফিরে যাও ফিঙেভাই ।"

করতাল এতক্ষণ চুপ করে ছিল । এবার গানের ভঙ্গিতে বলল, "নয়নকে এখনও অনেক পথ যেতে হবে । ওকে আর দেরি করিও না তোমরা । শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমরা ওকে বিদেয় দাও ।"

"বিদায় নয়নদাদা, পথে তোমার সাথী হলে আরও খুশি হতাম ।" ওরা ফিরে গেল ।

ডিঙি আর থামে না । শুধু চলে আর চলে । দিনের রঙ ঘোলা-ঘোলা । রোদের তেজ ঝিমঝিম । করতাল শেষ বিকেলের বিষাদভরা গলায় বলল, "ওই যে আশপাশে সব গাঁও দেখছ, গদখালি কামারডাঙা মসজিদবাটি আমলামেথি সোনাগাঁ দুলকি, এগুলো খুব বেশি দিনের নয় নয়ন । সব একশো কি দেড়শো বছরের মধ্যে । তার আগে এখানে গভীর জঙ্গল ছিল । বনে বাঘ ছিল, বুনো শুয়োর ছিল । বিষধর সাপ ছিল, রকমারি গাছ, পাখি, আরো কত কী । তখন মানুষ কোথায় ! মানুষের নামগন্ধও নেই । মাঝে-মাঝে বোম্বেটের দল, এই গা-ছমছম-করা জলেজঙ্গলে গা ঢাকা দিত । সুযোগ বুঝে হা রে রে রে করতে করতে শত্রুর ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত । তারপর একদিন মানুষ এল । ভীষণ হিংসুটে লোক তারা । হাতে কুড়ুল, শাবল, গাঁইতি, দা। শুরু হল বন কাটা । গড়ে উঠল নয়াবসত । মানুষের সঙ্গে ওরা পেরে উঠল না । চোখে ওদের আগুন । বুকে দুরন্ত সাহস । তাই না দেখে বনের জন্তুরা একদিন পালিয়ে গেল দূরে, অনেক দূরে । তবু মানুষ ওদের পিছু নিতে ছাড়ল না । আমরা সব কিছুরই সাক্ষী । আমাদের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে জোয়ার-ভাটায় শত শতাব্দীর কত কথা লেখা আছে নয়ন । বলে শেষ করা যাবে না । কত শুনবে তুমি ।" করতাল চুপ করে রইল । পুরনো দিনের কথা মনে হলে এখনও তার মন কেমন করে । মুখের ওপর বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে । একটু পরে আবার জলতরঙ্গের শব্দে হেসে উঠল । ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "আর তো যেতে পারব না নয়ন । আমার পথ এখানেই শেষ । কিন্তু কথা ফুরোল না । কথা ফুরোয় না । যেতে যেতে ওদের মুখেই বাকি কথা শুনে নিও । শুনতে শুনতে যেও । ক্লান্তি চলে যাবে । সময়ও কেটে যাবে । সন্ধের মুখেই পৌঁছে যাবে কোনও এক বনের ধারে ।" বলতে বলতে করতালের সুর কাটল । হাসি মিলিয়ে গেল । বুক ফুলে-ফুলে উঠল । ভীষণ মনখারাপ তার । নয়নকে ছেড়ে দিতে মন চায় না । এ-পথ ধরে তো কত লোকজন এল গেল । এখনও কত নৌকো লঞ্চ নিত্য যায় আসে । কিন্তু তারা কেউই তো নয়নের মতন নয় ! কেউ তো তাকে এমন করে দিদি বলে ডাকল না ! এত আপন করেও নিল না তো কেউ ! ভাবতে ভাবতে বুক ভারী । চোখ ঝাপসা । করতাল বলল, "এবার তোমাকে বিদ্যার হাতে তুলে দিলাম নয়ন । ও তোমাকে পথ দেখাবে । আমার আশীর্বাদ রইল । জয়ী হয়ে ফিরে এসো ভাই ।"

নয়ন হাত নাড়ল । একে একে সব পেছনে পড়ছে । লোকালয় হারিয়ে যাচ্ছে । সবুজ সবুজ গাছপালা চোখে পড়ল । নয়ন মোহনচূড়া পাখি দেখল । পাখিটা তো দেখতে বেশ ! খয়েরি ওর গায়ের রঙ, ডানা পিঠ লেজে আছে সাদা-কালো ডোরা ডোরা দাগ । মাথায় গোল পাখার মতো ছড়ানো কী সুন্দর ঝুঁটি ! শুধু কি তাই, সরু লম্বা বাঁকানো ঠোঁট । গলায় হু-পো, হু-পো-পো মিষ্টি সুরের ডাক । সেই ডাক শুনে নয়নের তো ঘুম পেয়ে যায় । এমন সময় পাখিটা ফুড়ুত করে উড়ে গেল । নয়নের ঘুমও গেল টুটে । যা দেখে তাই তার ভাল লাগে । খানিক আড়ালে থেকে দোয়েল শিস দিল । টুনটুনি টুনটুনাল । খানিক পরে সে এক ধনেশ পাখি দেখল । এরও তো বাহার কম নয় । নয়ন হঠাৎ শুনতে পেল, কাঠঠোকরা ক্লিক্-ক্লিক্-ক্লিক্-র-র করে চেঁচাল । মাছরাঙা চিঁরাক চিঁরাক ডাক পাড়ল । চাতক চি-ই-ই-ই করে চেঁচিয়ে উঠল । নয়ন চমকে ইতিউতি তাকাল । সে কী ! ওরা তো তার কাছ থেকে অনেকক্ষণ হল বিদেয় নিয়ে চলে গেছে ! আবার ফিরে এল যে ! তবে কি ওরা নতুন কোনও খবর নিয়ে এল তার কাছে !

বিদ্যাদিদি ওর হকচকানো মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল, "কী নয়ন, ঠকে গেলে তো ! আরে, ওটা হরবোলা পাখি ।"

"কিন্তু আমি যে ওদের ডাক স্পষ্ট শুনতে পেলাম বিদ্যাদিদি ।"

"শুনবেই তো । পাখিটা যে খুব রঙঢঙ জানে । লোককে একবার বোকা বানাতে পারলে ওদের ভারী মজা । ওরা যে অন্যের স্বর নকল করায় খুব ওস্তাদ । একটার পর একটা সুর নকল করে ওরা এমনভাবে ডেকে যাবে যে, টেরই পাবে না । ওই দ্যাখো উড়ে গেল পাখিটা ।"

নয়ন দেখল, ঘাসের মতন সবুজ রঙের একটা পাখি গলায় হরেক রকম সুর তুলতে তুলতে উড়ে গেল ।

একটু পরে বিদ্যাদিদি বলল, "ওই দ্যাখো নয়ন, একটা গ্রাম । মালোপাড়া । ওই মালোপাড়ার ঘরে ঘরে কত কান্না । ওদের ঘরের কেউ না কেউ মরদ বনে গিয়েছিল মাছের জঙ্গল করতে । কেউ ফিরল, কেউ ফিরল না । ওদের বউ-ঝি'রা এখনও কাঁদে । যখন সাজন সাজিয়ে সাঁঝ ভাসে, যখন পুন্নিমে অমাবস্যির জো'য় নদী-নালা-খাল খাঁড়ি ফুলে ফেঁপে ওঠে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, পাড়া নিঝুম, তখন ওরা ডুকরে ডুকরে বিলাপ পাড়ে । চোখের জল ওদের শুকোয় না । কান্না শুনলে বুক ফাটে ।"

নয়ন চুপ করে শোনে । উদাস, করুণ চোখে চেয়ে থাকে । তারও মা'র মলিন মুখ মনে পড়ে । তার মা'ও তো কত রাত্তিরে দাওয়ায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে । নয়ন কোনও কথা খুঁজে পেত না । মা'র বুকে মুখ লুকোত তখন ।

নয়ন চুপ করে আছে । বিদ্যাদিদি বলল, "দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে নয়ন । সন্ধের পর আজকের মতন তোমার যাত্রাও শেষ । তখন কোথাও বিশ্রাম নিও । আমাদেরও তখন

কাউকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া বারণ। তাতে তোমারই খারাপ।"

"কেন?"

"বা রে, জঙ্গলের একটা নিয়ম আছে না। আর সেই নিয়ম বড় কড়া। জানো না তো, একবার এই নিয়ম ভাঙলে কত কী ঘটে যায়।"

"কী হয়?" নয়নের জানার ভীষণ কৌতূহল। সে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

"কী আবার, বনে আগুন লাগে। গাছ পোড়ে। পশুপাখি মরে। জল শুকিয়ে খটখটে। নদীর বুকে নতুন চরা ভাসে। লোনাঝড় চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে। ভয়ে সব ঠকঠক করে কাঁপে।"

নয়ন অবাক। তার মুখে কথা নেই।

বিদ্যাদিদি ফের বলতে শুরু করল, "রাত্তিরে বনের ঘুম ভাঙে। ভূত-প্রেত-দত্যিদানোরা তখন শনশন ছুটে বেড়ায়। পরির দল নেমে আসে। বনবিবি ঘুরে বেড়ান। ওপর থেকে বাইশ ফকির নেমে আসেন। গাজিসাহেব ঘুরে ঘুরে সব দেখেন। বনবিবির ভাই শাহজঙ্গলির হাতে থাকে খাপড়া। কাঁধে হেঁতালের ডাল। ওই খাপড়া দিয়ে তিনি ছদ্মবেশী দক্ষিণ রায়কে তাড়া করেন। হেঁতালের ভয়ে সাপটাপ কাছে ঘেঁষতে পারে না। তোমায় একটা কথা বলি নয়ন, জঙ্গলে ঢোকার আগে, যিনি যেখানেই থাকুন, ওইসব দেবদেবীর নাম নিও। নাম নিও ওই সব পির-ফকিরের।"

নয়ন মাথা নাড়ে। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে ওঠে। সে এদের উপকারের কথা কোনও দিনও ভুলতে পারবে না। সবার কাছেই তার ঋণ। মনে মনে সবাইকে সে একবার প্রণাম করল।

বিদ্যাদিদির কথা তখনও শেষ হয়নি। আবারও বলতে শুরু করল, "এক এক করে আরও অনেক কিছুই তুমি জানতে পারবে। যত এগোবে, সবাই তোমার কানে কানে এসে সব বলে যাবে। আরও কত কী ওরা শিখিয়ে দেবে। যে যা বলে সবার কথাই শুনো নয়ন। কারও মনে দুঃখু দিও না। কাউকে আঘাত কোরো না। ভালবাসার কথা বোলো। দেখবে, ওরাও তোমায় ভালবাসবে। তোমাকে ওরা মাথায় নিয়ে ধেই ধেই করে নাচবে। তোমার গায়ে তিল-পরিমাণ আঁচড়ও কেউ কাটতে পারবে না। ওরাই তোমাকে আগলে রাখবে। কতকাল, ওরা তোমাদের কাছে কোনও ভালবাসা পায়নি নয়ন। ওদের মনেও যে কত কষ্ট, তার তো কোনওখবর রাখো না তোমরা।"

এদিকে দিনের আলো নিবু-নিবু। এখানে-ওখানে পাতলা নরম নরম ছায়া জমছে। দল বেঁধে পাখিরা ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। নদীপথ নির্জন। মালোপাড়ার দিক থেকে একটা চাপা-কান্না তখনও পিছু-পিছু আসছে।

বিদ্যাদিদি এবার নয়নকে ছেড়ে এগিয়ে যাবে। খানিক চুপ করে থেকে ও বলল, "আমি এবার যাব যে নয়ন! এখন দুর্গাদুয়ানিই তোমাকে নিয়ে গিয়ে গুমোরের হাতে তুলে দেবে। কাছেই সজনেখালির জঙ্গল। অনেক পাখি দেখবে সেখানে। গুমোর-বোনই তোমাকে আজকের রাতের মতন কোন জঙ্গলে থাকবে বলে দেবে।" এই বলে বিদ্যাদিদি চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

নয়নের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। চোখ ফেটে জল এল। চুপটি করে বসে রইল।

সজনেখালির কাছাকাছি এসেছে নয়ন, আর ঠিক তক্ষুনি বনের আড়ালে সুয্যিঠাকুর মুখ লুকোলেন। দেখতে দেখতে আঁধার নামল। জলের রঙ কালচে হল। খানিক দূরে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া জঙ্গল চোখে পড়ল। বুকের ভেতর শিরশির করে। নয়ন সেদিকে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। চোখের পলক আর পড়ে না। গাছের পাতায় হাসির ঝিলিক। ডালে ডালে বাঁদরের নাচন-কোঁদন। বাচ্চা-বাঁদর মুখ ভেংচাল। কিচ কিচ শব্দ করে তেড়ে এল। মা-বাঁদর তাকে সেলাম জানাল। বাকিরা আরো কত কী রঙ্গ করল। তাই না দেখে নয়নও ভারী মজা পেল। হেসে তো সে কুটিকুটি। তারপর শুরু হল পাখির কিচিরমিচির। জলের কিনারে এসে জড়ো হল আরও কত রঙ-বেরঙের পাখির দল। নয়ন আনমনা। গুমোরদিদির কথায় তার চমক ভাঙল।

গুমোরদিদি বলল, "এই শুরু হল সেই জঙ্গল। এরপর যত ভেতরে যাবে, দেখবে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। খাল-বিল-খাঁড়ি-নদীর ছড়াছড়ি। আজকের মতন এখানেই যাত্রা শেষ। ওই যে দেখছ গরানের বন, ওখানেই তোমার আজকের রাত্তিরবাস। আবার কাল ভোরে যাত্রা শুরু। এখনও তোমাকে কত পথ যেতে হবে নয়ন। এবার ওরা তোমাকে পথের খোঁজ দেবে।" গুমোরদিদি গরানের কানে কানে কী বলল। নয়নকে ওর হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

বনের ধারে ডিঙি থামল। বনে বনে সাড়া জাগল। পাতায় পাতায় বোল উঠল। নয়ন এখানে আজকের রাতের অতিথি। এদিক-ওদিক সে তাকাল। ডিঙি থেকে ঝটপট করে সে লাফিয়ে পড়ল। হাতে তার তীর-ধনুক। পাখিদের কিচিরমিচির তীব্র হল। ভয় পেয়ে ওরা সরে গেল। নয়ন তো

হকচকিয়ে যায়! কী ব্যাপার! ওকে দেখে সবাই এমন তটস্থ! দূরে গিয়ে ওরা উঁকিঝুঁকি মারছে। ওকে দেখছে। কাছে আমার সাহস নেই। সে ভেবেই পায় না, তাকে ওদের এত ভয়টা কিসের! সে নরম চোখে তাকায়। মনে-মনে সে বনবিবির নাম নিল।

ওদের মধ্যে একজন, যার গায়ের রঙ বাদামি-বাদামি, বয়েসে তরুণ, লম্বাটে ঠোঁট, ঠোঁটের ওপর নীল কালোর ফোঁটা কাটা, ঠোঁটের তলায় চামড়ার থলে, তারও রঙ ফিকে বেগুনি, সে-ই এখন একটু একটু করে এগিয়ে এল। গলা বেঁকিয়ে নাম বলল, "আমি গগনবেড়।"

"আমি নয়ন।"

"তোমার হাতে ওটা কী?"

"তীর-ধনুক।"

"তবে আমরা পালাই।" বলেই ক'পা পিছিয়ে গেল পাখিটা। চোখের কোণে ভয় জমল।

নয়ন ভুরু কোঁচকাল, "পালাবে কেন ভাই?"

"তীর-ধনুকে বড় ভয়, বুক যে কাঁপে থরথর।"

নয়ন এবার হিহি করে হাসল। তারপর ছড়া কাটার ভঙ্গি করে বলল, "তীর-ধনুকে মিছেই ভয়, ওটা কিন্তু আসল নয়।"

"তবে, তবে," ওরা বেশ মজা পায়। ওরা আর ভয় পায় না নয়নকে। নাচতে নাচতে কাছে এগিয়ে এল।

নয়ন এবার আসল কথাটা ওদের বলল, "আমার বাবা এসেছিল বনে, আর ফিরল না। আমি এসেছি বাবাকে মারার শোধ নিতে। তোমরা আমাকে পথ দেখাবে ভাই?"

"হুঁ, আগে সকাল হোক, তারপর।"

আর ভয় নেই ওদের। নয়নকে ওরা বন্ধু করে নিল। নির্ভয়ে সবাই এগিয়ে এল। নয়ন ওদের কাউকেই চেনে না। শুধু নরম চোখে ওদের দিকে সে চেয়ে থাকল।

"ল্যাগবেগে কাঠির মতন সরু সরু লম্বা পা নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। সরু মাথা, সরু গলা। ছুঁচলো, শক্ত হলদেটে ঠোঁট। অনেকটা ঠিক বর্শার ফলার মতন। গলার মাঝ-বরাবর কালো কালো ফোঁটা-মতন দাগ। মাথার দিকে ঝোলানো কালো রঙের লম্বা ঝুঁটি। পরিচয় দিল, "আমার নাম সাদা কাক।"

নয়ন বলল, "তা সাদা কাকভাই, সাদা কাকভাই, যে বনে আমার বাবা গিয়েছিল মধু আনতে, সেখানে আমাকে একবারটি নিয়ে যাবে ভাই?"

"হ্যাঁ, ভোরের আলো আগে ফুটুক তো, তারপর।"

সাদা কাক সরে গেল। আবার একজন এগিয়ে এল। নাম বলল সোনাজঙ্ঘা। দেখতে ভারী সুন্দর। এরও পা সরু-সরু, লম্বা-লম্বা। পালকের রঙ ধপধপে সাদা। তার ওপর সবুজ কালোর ছোপ-ছোপ দাগ। বুকের নীচেও গোল গোল কালো রঙের ছিট। ঠোঁটের রঙ হলুদ। লম্বাটে আর ভারী। ডগাটা একটু বাঁকানো।

নয়ন ওকে দেখতে দেখতে অনুরোধ করল, "সোনাজঙ্ঘা, বাবা আমার যে-বন থেকে আর ফিরল না, তুমি কি আমাকে সেখানে যাওয়ার পথ চিনিয়ে দেবে?"

"দেব, রাতটা আগে শেষ হতে দাও, তারপর।"

সোনাজঙ্ঘা চলে গেল। সেখানে এল আরেকজন। বলল, "আমি ধানঠুঁটি।" পালকের রঙ সাদা, হালকা গোলাপি। প্যাকাটির মতন লম্বা সোনালি রঙের পা। বাঁকানো ও লম্বাটে ধরনের গলা। ঠোঁটের গড়ন ভারী, গোলাপি রঙ। ঠোঁটের মাঝখান থেকে খানিকটা মচকে ভেঙে নীচের দিকে বেঁকে গেছে।

নয়ন বলল, "ধানঠুঁটি ভাই, তুমি আমাকে বাবার ওখানে যাওয়ার পথ চিনিয়ে দিও।"

"আচ্ছা, আগে তো রাত পোহাক, তারপর।"

এবার অন্য একজন এল। মাথা নেড়ে বলল, "আমাকে সবাই খুন্তেবক বলেই ডাকে।" তারও গায়ের রঙ সাদা। পা আর গলা লম্বাটে। চ্যাপ্টা ধরনের ঠোঁট। কালো আর হলুদ-মেশানো রঙ। ঠোঁটের ডগা চামচের মতন চওড়া।

নয়ন তাকেও বলল, "খুন্তেবক ভাই, তুমি তো আমার সবই শুনলে, এবার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে না?"

"নিয়ে যাব ভাই, নিয়ে যাব। সে তো কাল ভোরে।"

এরপর আরও অনেকেই এল সেখানে। নিজের নিজের পরিচয় দিল সবাই। কেউ বলল, "আমি শামুকখোল।" কেউ বলল, "আমি কালো কাস্তেচরা।" কেউ বা বলল, "আমি গাঙচিল।" কেউ পরিচয় দিল, "আমি ভুতুম পেঁচা", "আমি শঙ্খচিল"। এমনি আরও কত নাম।

সাহস পেয়ে জলপিপি, কোঁচবক, কাদাখোঁচা এমনি আরও কত পাখির দল তার কাছে এগিয়ে এল। আলাপ করল। জলপিপি বলল, "শোনো নয়ন, আমাদেরও অনেক বলার আছে। জানো ভাই, যারাই আসে বনে, তারা একবার আমাদের দেখলেই হল, অমনি তাড়া করে। সুযোগ পেলে মেরেও ফেলে। আমাদের ওপর কী যে লোভ তোমাদের। আমরা তো ভাই তোমাদের কিছু করি না।"

ডাহুক মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ ভাই, তোমাদের শরীরে যদি কোনও দয়ামায়া থাকে। তোমরা বড় নিষ্ঠুর। আমাদের মারতে কেন যে তোমাদের এত আনন্দ বুঝি না!"

লম্বা সরু পা ফেলে একটা পাখি এগিয়ে এল। পায়ের আঙুলগুলো তার কী লম্বা লম্বা। ঠোঁটের রঙ লাল। লাল রঙের কপাল। বেগুনি আর নীল-মেশানো গায়ের রঙ। বেঁটে লেজ। লেজের নীচে সাদা রঙের ছোপ। সে এবার মুখ খুলল, "আজ সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন তোমাকেই শোনাই নয়ন। যাই বলো না, মানুষ বড় লোভী। যা পায় তাই খেতে চায়। খেয়ে খেয়ে লোভ বেড়ে গেছে। সেই লোভে লোভে কত শিকারি যে ছুটে আসে এখানে, আমরা টেরও পাই না। সরল মনে ঘুরে বেড়াই। ব্যস, একবার দেখল তো আর নিস্তার নেই।"

পানকৌড়ি গলা বাড়াল, "নয়ন ভাই, নয়ন ভাই, আমাদের কথাও তুমি গিয়ে মানুষকে বোলো, আমরা তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করি না, তবে তোমরা আমাদের এভাবে মারো কেন?"

শামুকখোল নালিশ করল, "তোমরা বড় যুদ্ধবাজ। তোমাদের হাতে থাকে নানান রকমের হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার নিয়ে তোমরা কত কী জয় করলে। তবু তোমাদের লোভ গেল না।"

এমনি করে একের পর এক অভিযোগ। নয়ন ঘাড় হেঁট করে ওদের সব কথা শুনল। ওদের কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। ওরা তাকে ভালবেসেছে। সেও ওদের ভালবাসে।

তারপর আজকের মতন বিদেয় নিয়ে ওরা চলে গেল। আবার কাল ভোরেই চলে আসবে।

এদিকে রাত বাড়ছে। একটানা ঝিঁঝি ডাকছে। জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। নয়নের খিদে পেয়েছে। সেই কোন্ সকালে সে বেরিয়েছিল। এখন একটু ক্লান্ত। খানিক পরে নয়ন দ্যাখে, বনমুরগি তার জন্যে ডিম নিয়ে এল। মউপোকারা মধু দিল খেতে। গাছেরা দিল ফলফলারি। নয়নের খুশি আর ধরে না। মহাসুখে যা পারল সে খেল। বাকিটা রেখে দিল। আঃ, বড় তৃপ্তি।

গরানগাছ বলল, "আরও খানিকটা এগিয়ে যাও নয়ন।"

"বড় অন্ধকার, পথে যে কিচ্ছু দেখা যায় না।"

"জোনাকি তোমাকে আলো দেখাবে।"

নয়ন সেই টিমটিমে আলোয় এগিয়ে চলল। ঝোপেঝাড়ে গাছগাছালিতে ঠাস-বুনন। পায়ে পায়ে বেড় লাগে। সাড়া পেয়ে সরসর করে কী একটা চলে গেল। নয়ন থমকে দাঁড়াল। কানে কানে বাতাস বলল, "ভয় নেই নয়ন, ভয় নেই।"

নয়ন এগোয়। এগিয়েই চলে। যেতে যেতে শুনতে পেল গরান বলছে, "এবার তুমি থামো নয়ন। ওই যে দেখছ ধুঁধুলগাছ, ওরই ডালে ঘুমোবে আজ।"

নয়ন দেখল, ওর সামনে দুটো ডাল নেমে এসেছে। নয়ন কিছু বলার আগেই ধুঁধুল বলল, "এবার তুমি উঠে এসো নয়ন।"

নয়ন বসল ডালে। অমনি ডাল উঠল ওপরে। দুহাত দিয়ে ধুঁধুলদাদা যেন আদর করে তাকে তুলে নিল বুকের মাঝে।

"আর তোমাকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না নয়ন," পাশ থেকে গরান বলল।

ধুঁধুল বলল, "এবার তুমি ঘুমোও নয়ন।"

"ঘুম যে আসে না ধুঁধুলদাদা! বাবার কথা যে খুব মনে পড়ে।"

গরান তাকে জানাল, "তোমার বাবাও এসেছিল এই বনে।"

"বাবার অভাবেই তো এত দুঃখ আমাদের।" বলতে গিয়ে তার গলা ধরে। ঠোঁট কাঁপে।

গরান তাকে বুঝিয়ে বলল, "কালই তো সাঁঝের বেলায় তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে নয়ন। সেখানেই বনের দেবীর দেখা পাবে। তখন বনবিবিকেই প্রশ্ন কোরো, কেন তোমার বাবার এমন দশা হল। এবার ঘুমিয়ে পড়ো নয়ন।"

"না গো গরানদাদা, এখন আমার চোখে ঘুম আসবে না। তুমি বরং গপ্পো শোনাও।"

"কী আর গপ্পো তোমায় শোনাব ভাই!" একটু সময় চুপ করে থাকে গরান। পাতায় পাতায় শব্দ হয়। ফিসফিসিয়ে কারা যেন কথা বলে। খানিক পরে গরান আবার বলতে শুরু করে, "তা হলে শোনো নয়ন, যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে এমনি অনেক জঙ্গল দেখবে। এই যেমন, এটা দেখছ গরানের বন, তেমনি কোথাও দেখবে কেওড়ার বন, কোথাও বা গেমার। একটার পর একটা এমনি আরও সব জঙ্গল। এমনি করেই তুমি পেরিয়ে যাবে, পরেশ পিপুল্, পশু, বাণী, আকাশমণি, হেঁতালের জঙ্গল। দেখবে কোথাও বসেছে তরা গাছের মেলা, কোথাও গোলপাতার ঝুপড়ি। আরও ভেতরে গেলে দেখতে পাবে, সুঁদরির বন। সেই থেকেই তো এর নাম হয়েছে সুন্দরবন। ওরা তোমাকে ডাকবে নয়ন। ওদের কথা তুমি শুনো কিন্তু। তবে সব জঙ্গলেই অন্য গাছও তো কিছু-কিছু মিলেমিশে থাকে।" এ পর্যন্ত বলে গরান তো থামল। কিন্তু তখনও তার অনেক কথা বাকি। আজ তাকে কথায় ভর করেছে। নয়ন তাকে উশকে দিয়েছে। কত কথাই না তার মনে পড়ছে। এই বনের পাতায় পাতায়, ঘাসে ঘাসে, গাছে গাছে, সব কথা যেন যুগ যুগ ধরে বোবা হয়ে আছে। আজ তারা কথার ফুলঝুরি হয়ে ফুটতে চায়। গরান একসময় ছটফট করতে করতে আবার বলল, "আমাদের মনেও অনেক, অনেক দুঃখ জমে আছে নয়ন।"

নয়ন চুপটি করে সব শুনে যায়। শুনতে শুনতে উদাস হয়। দুঃখের কথা শুনলে তারও বুক কেমন করে। মুখের ওপর আঁধার নামে। এখানেও কি সবাই তারই মতন দুঃখী? কী ভেবে সে প্রশ্ন করে, "তোমার আবার কিসের এত দুঃখ গরানদাদা?"

"তা বলতে গেলে ভাই অনেক কথা। আমাদের দুঃখে বনের পশু কাঁদে, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে, পাখি কাঁদে, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে, নদী কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু মানুষের মনে তার আঁচড়টাও লাগে না।"

"কেন গরানদাদা, মানুষ তো গাছ লতাপাতা খুব ভালবাসে!"

"সে তো কোন্ আদ্যিকালের কথা। মানুষ কবে তা ভুলে গেছে। এখন আর আমাদের ওরা ভালবাসে না। মানুষ এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। সেজন্যেই তো আমাদেরও দুঃখের আর শেষ নেই। তুমি তো জানো না নয়ন, এই পৃথিবীতে পরম নির্ভয়ে কতকাল আমরা একসঙ্গে গলাগলি করে কাটিয়েছি। কত সুখেই না আমরা ছিলাম তখন। তারপর মানুষের একদিন মতিভ্রম ঘটল। সেই সুখের দিনও গেল

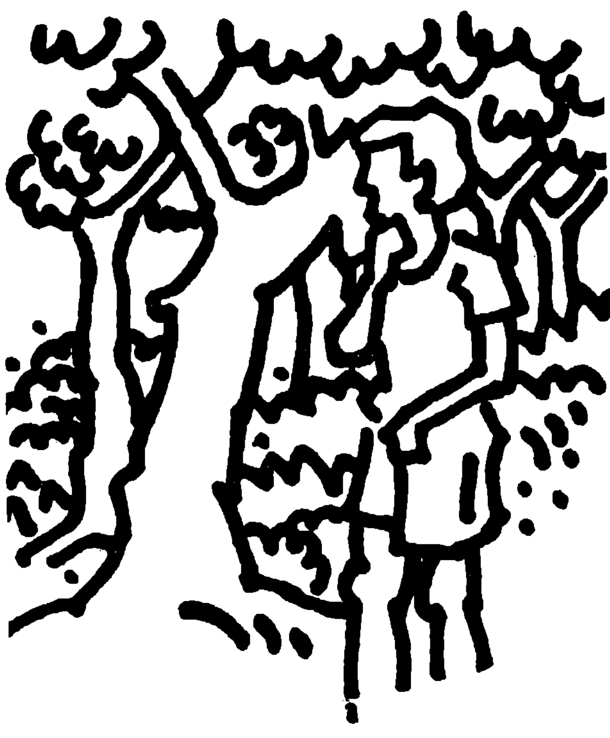

হারিয়ে। তোমাদের হাতে এল নানান ধরনের হাতিয়ার। তোমরা একের পর এক বন কাটতে শুরু করলে। নতুন নতুন শহর বানালে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে। আমাদের মেরেধরে তোমরা তাড়িয়ে দিলে। আমরা তো প্রতিবাদ করতে জানি না। আমরা হটতে হটতে চলে এলাম অনেক দূরে। এখানেও তোমরা লোভের হাত বাড়াও। এখানেও তোমরা তেড়েফুঁড়ে আসো। গাছপালা সব কেটেকুটে নিয়ে যাও। দ্যাখো না, কত গাছগাছড়া সব কেটে নিয়েছে। আরও নিত, হিংস্র জন্তু-জানোয়াররা আছে বলেই এখনও খানিকটা রক্ষে। তা না হলে, কবে শেষ হয়ে যেতাম। আমরাই ওদের লুকিয়ে রাখি। মানুষ এলে সাবধান করে দিই। সহজে আমরা প্রতিশোধ নিই না। আমরা যদি এর শোধ তুলতে চাই, তা হলে জেনে রেখো, তোমাদের কাছে তা হবে ভয়ঙ্কর। মুহূর্তে তোমাদের সব অহঙ্কার চুরমার হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমাদের শেষ করে কি তোমাদের খুব একটা লাভ হবে ভাবছ, মোটেও না, এবার ফিরে গিয়ে মানুষকে বোলো নয়ন, আরও বড় এক সর্বনাশ যে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সেই মহাপ্রলয়ের দিন কি আর খুব দূরে ভাবছ? তা নয়। আমাদের চোখের জলে তোমাদের স্বপ্নের সাজানো-গোছানো পৃথিবীটা দেখবে একদিন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

নয়ন আঁতকে ওঠে। গরানদাদা এ তাকে কোন্ অভিশাপের ছবি দেখাচ্ছে। সে কাতর গলায় বলল, "এমন করে আর বোলো না গরানদাদা। শুনলে আমারও বুক ধড়াস ধড়াস করে।"

"শুধু এখানেই নয় নয়ন, যেদিকে যাবে, সেদিকেই শুনবে সেই হাহাকার। চোখে পড়বে মানুষের নানান অত্যাচারের সব চিহ্ন।"

নয়ন কোনও কথা বলতে পারে না আর। তার মনে যেন এক দুঃখের পাহাড়। তার বাবাও কতবার বনে এসেছিল।

কত কী নিয়ে গেছে এখান থেকে। বন বুঝি তাই এর শোধ নিল।

নয়ন চুপ করে আছে দেখে গরান বলল, "তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, মনের মানুষ পেয়ে তোমাকে সব বললাম।"

এমন সময়ে বাতাসে কার ফিসফিস শোনা গেল। পাখিরা পাখা ঝাপটাল। গাছের পাতা কাঁপল। ডালে ডালে দোলা লাগল। ভুতুম পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। হঠাৎ কী যেন একটা দেখতে পেয়েছে ওরা। ধুপধুপ পায়ে কী হেঁটে গেল।

নয়ন সোজা হয়ে বসল। গরান কানে কানে তাকে বলল, "ভয় পেয়ো না নয়ন, তেনাদের এখন আসবার সময় হয়েছে।"

"তেনারা?" নয়ন অবাক। তীর-ধনুকে হাত রাখল।

"তেনারা মানে, যারা এই বনে এসেছিল, কিন্তু ফিরে গেল না আর, সেইসব অশরীরী আত্মা। রাত বাড়লে মাঝে-মাঝে ওরা ঘুরে বেড়ায়। ওই শোনো নয়ন, ওরা তোমাকে কী একটা বলতে চাইছে।"

বাতাসে চাপা কান্নার সুর ভেসে আসছে। সে কান খাড়া করে রাখল। হঠাৎ সে দেখল, কতগুলো ছায়া তার সামনে দুলছে। কান্না থেমে গেছে। কে একজন তার কানে কানে নাকি সুরে বলল, "আমি সাতজেলিয়ার গগন হালদারের ছেলে হরিপদ। ঘরে আমার বউ ছিল, বাপ ছিল, মা ছিল। আর ছিল আট বছরের ছেলে বুধন। বাপ আমার বাতব্যাধিতে পঙ্গু। ঘরে অভাব। পেট তো মানে না। বাপ আমার মহাজনের ঘরে দেনার দায়ে বাঁধা। তাই, আমি এলাম জঙ্গল করতে। গরানের ডালে নৌকো বোঝাই করলাম। সেদিনের মতো কাজ শেষ। আন্ধার রাতে দিষ্টি চলে না। খালের মাঝেই নৌকো নোঙর করলাম। শুতে না শুতেই ঘুম। মাঝ রাত্তিরে খাঁড়ি সাঁতরে বড়মামা কখন এসে নৌকোয় চড়ল, টেরও পেলাম না। চুপিচুপি এসে টেনে নিল রে নয়ন, আর ঘর যাওয়া হল না। বনে বনে ঘুরে বেড়াই। সুবল বাওলের ছেলে তুই, আমরা জেনেছি তোর তীর-ধনুকে জাদু আছে। তুই এর প্রতিশোধ নে, প্রতিশোধ নে নয়ন। আমরা তবে খুশি হই।" বলতে বলতে সুর মিলিয়ে গেল। একটা ছায়া সরে গেল।

আবার একটা ছায়া নড়ল। খোনা সুরে বলতে লাগল, "আমি ঝড়খালির পুলিন বেরা। বিধবা মায়ের এক ছেলে। আমি এসেছিলাম মা'র সঙ্গে ঢেঁকির কাঠ নিতে। কাঠ নিয়ে ফিরছি, মা চলেছে আগে, আমি আছি পেছনে। অমনি বড় শেয়াল চোখের নিমেষে এসে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। মা আমার হাঁউমাউ করে কত চেঁচাল। বড় শেয়াল শুনলে তো! পিঠে ফেলে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। মা আমার বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে ঘরে ফিরল। মা'র কাছে গপ্পো শুনেছি, আমার বাপও আসত বনে কাঠ নিতে। একদিন আর ফিরল না। নয়ন রে, আমার মা'র বড় দুঃখ, মা না জানি চোখের জল মুছতে মুছতেই অন্ধ হয়ে গেল। তুই এর শোধ নে রে নয়ন, শোধ নে। তাই না দেখে আমরা একবার হিহি করে হাসি। হাসতে হাসতে বন কাঁপাই।" বলতে বলতে বাতাসে মিলিয়ে গেল ছায়াটা।

একটু পরে আরেক ছায়া এল। চিঁচি সুরে বলল, "আমি মোল্লাখালির হাসন মিঞা রে নয়ন। তোর বাপের সঙ্গে আমি

কতবার জঙ্গল করতে এসেছি। জঙ্গল করতে করতে বুড়ো হলাম। কিন্তু সেবার যে কী হল আমার, আমি এলাম মাছের জঙ্গল করতে। ঘরে খাওয়ার লোক মেলা। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। মাথার ঠিক থাকে না। ঠিক ওই সময়েই কচুখালির সুরেন মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সামনের কোটালে দেড়-দু'মাসের জন্যে সাঁয় ভাসবে জলে। সুরেন মণ্ডলই সাঁয়দার। মনের কথাটা খোলসা করে ওকে বললাম। আগাম টাকাও দিল কিছু। তাই দিয়ে চালডালের ব্যবস্থা হল। তারপর পাঁজিপুথি দেখে সাঁয় তো ভাসল। মাছও পড়ল অঢেল। খইয়ের মতন ফুটফাট লাফঝাঁপ। মনের মধ্যেও খুশির নাচন। খেয়ালই নেই। জুম্মাবারেই জঙ্গলে দিলাম পা। তখনই মনটায় আমার কামড় দিল রে নয়ন। শেষকালে জঙ্গলের নিয়ম ভাঙলাম! ঠিক তার পরদিনই বড় মিঞা এসে আমাকে টেনে নিল। জ্বলুক, জ্বলুক, প্রতিহিংসার আগুন জ্বলুক। সেই আগুনে বন পুড়ুক। বনের জন্তু-জানোয়ার সব পুড়ে মরুক। তবে তো মনের জ্বালা জুড়োয়।" ছায়া সরে গেল।

এমনি করেই এক ছায়া যায়, আরেক ছায়া আসে। কারও ঘর ছিল আমলামেথি, কারও বা ছিল গদখালিতে। কেউ এসেছিল হেঁতালবাড়ি থেকে, কেউ বা ছিল দুলকি গাঁয়ের বাসিন্দে। একের পর এক শুধু অভাব আর অভাবের ফিরিস্তি। তারপর ছায়ারা সব দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

গরান বলল, "আজ আর ওরা আসবে না নয়ন।"

"কেন?"

"এখন যে গাজিসাহেব ঘুরে ঘুরে বন দেখবেন, ওরা গাজিসাহেব আর বনবিবিকে খুব ভয় পায়। তাড়াতাড়ি করে তাই তো ওরা পালিয়ে গেল।"

নয়ন মনে মনে গাজিসাহেবের নাম নিল। নাম নিল বাইশ ফকিরের।

রাত আরও গভীর হল। বনের পশুরা ঘোরাঘুরি করল। খাবার ধরে ধরে খেল। পাতা কাঁপল থিরথির করে। নয়ন কাঁপল থিরথির করে। নয়ন হঠাৎ দেখল, একটা গাছের তলায় হাজার বাতির রোশনাই। সেই আলোয় পোকামাকড়রা ছুটে এল। তারপর ইয়াবড় এক গোখরো সাপ পটাপট সব মুখে পুরতে লাগল। যেই না ওর পেট ভরে গেল, অমনি এসে গপ করে আলোটা গিলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আঁধার আরও দ্বিগুণ হল।

গরান ফের ওকে বলল, "রাত যে প্রায় শেষ হয়-হয়, এবার তুমি ঘুমোও নয়ন।"

"হ্যাঁ, গরানদাদা, এখন আমার খুব ঘুম পাচ্ছে," আস্তে আস্তে নয়নের চোখে ঘুম নেমে এল।

হঠাৎ বন-মুরগি ডেকে উঠল, কঁক-কঁয়া। নয়নের ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ মেলে তাকাল। ভোর হয়েছে। একে একে পাখিরা সব আসতে শুরু করেছে। নয়ন নীচে নামল। তীর-ধনুক কাঁধে নিল। দেখতে দেখতে আলো ফুটল। নয়ন এবার তৈরি। ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে এল। এসে এবার নৌকোয় উঠল। ভুতুম পেঁচা বসেছে নৌকোর গলুইয়ে। মাথার ওপর হাজার হাজার পাখি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশাল এক ছায়া। নয়নকে নিয়ে ওরা যাবে আজ অনেক দূরে। বাতাসে তার শাঁই শাঁই শব্দ। নয়ন আবার নৌকো ভাসাল। নৌকো ছুটল সে কোন্ অচিন বনের দিকে। আসার

সময় গরান তার হাতে দিয়েছে খাপড়া, কাঁধে তুলে দিয়েছে হেঁতালের লাঠি।

নয়ন এগিয়েই চলেছে। যেতে যেতে আরও কত নদী খাঁড়ি পার হল, আরও কত বন তাকে ডাকল। কাউকেই সে নিরাশ করল না। সবার কাছেই গেল। ওদের মনের কথা শুনল। সবারই এক নালিশ, 'নিজের চোখেই তো দেখলে নয়ন, মানুষ আমাদের কী দশা করেছে।' যেখানেই যায়, সেখানেই সে শোনে, ওরা তাকে বলছে, 'দেখে যাও নয়ন, মানুষ আমাদের হাত কেটেছে, পা কেটেছে। চোখ নিয়েছে, মাথা নিয়েছে। এত করেও মানুষের তৃপ্তি নেই, সুখ নেই।' বনে বনে শুধু এই বুক-ফাটা চাপা-কান্নাই ভেসে বেড়ায়।

নয়ন মাথা নিচু করে থাকে। বলার মুখ নেই। তার বুকেও ব্যথা বাজে। এমনি করেই সে দত্তর-গাঙ, নেতা-ধোপানির ঘাট পেরোল। তারপর আরও কত নদী খাল পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল। চলছে তো চলছেই। দুপুর শেষ হল। বিকেলও এবার পালাই-পালাই। পথ তো আর ফুরোয় না! কোন্ সুদূরে পথের শেষ? মৃদু পায়ে আঁধার নামছে। এবার বুঝি দিনের শেষ। আর যেই না সন্ধের মুখ উঁকি মারল, অমনি সে এসে পৌঁছল এক গভীর বনের ধারে।

ভুতুম পেঁচা বলল, "এই বনেই তোমার বাবা এসেছিল নয়ন।" বলতে বলতে উড়ে গেল।

পাখিরা বলল, "এই সেই বন। এবার তুমি এগিয়ে যাও। এখানেই বনবিবির দেখা পাবে।" ওরা উড়তে উড়তে গিয়ে গাছের ডালে বসল।

নয়ন তাকাল একবার। বন থেকে একমুঠো হাওয়া ছুটে এল। তার গা ছুঁয়ে যেতে যেতে কানে কানে সেই বাতাস যেন বলল, "ওরে নয়ন, এখানে কেন এলি রে তুই? ঘরে ফিরে যা তুই, ঘরে ফিরে যা।" নয়ন চমকে উঠল। মনে হল তার বাবার গলা। বুকের মধ্যে কে কুটুস-কাটুস কামড় দিল।

দুঃখের নদী উথলে উঠল। খানিক বাদে তার বিভ্রম কাটল। এরপর মনে মনে সে পির-ফকির, বনবিবির নাম নিল। সে ডাঙায় নামল। হাতে নিল ধনুক। ধনুকে জুড়ল খাপড়ার তীর। কাঁধে আছে হেঁতালের লাঠি। আর তো বাতাস বয় না। গাছের পাতা নড়ে না। টুঁ শব্দও নেই। সব কেমন থমথমে। এবার তার প্রতিশোধের পালা। নয়নের চোখে আগুন ঝরে। সে এগিয়ে যায়।

মানুষের সাড়া পেয়ে গোখরো-কেউটেরা হিস হিস করতে করতে তেড়ে এল। যেই না দেখল, হেঁতালের লাঠি, অমনি ওরা ফণা নামিয়ে ঝোপেঝাড়ে গিয়ে মুখ লুকোল। ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে বুনো শুয়োর ছুটে এল। তীর-ধনুক দেখে ওরা আর কাছেই ঘেঁষল না। চোখের পলকে উধাও। তারপর এল গরগর করতে করতে বনের রাজা ব্যাঘ্রমশাই। যেই না দেখল খাপড়ার তীর, অমনি লেজ গুটিয়ে দে-ছুট।

নয়ন এগিয়েই চলে। কেউ তো আর তার সামনে আসে না! যে দ্যাখে সেই পালিয়ে যায়। গরানের পাশ দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, তখন কানে কানে গরান তাকে বলে দিল, "নয়ন, ডাইনে যাও।"

ধুঁধুল বলল, "এবার বাঁয়ে ঘোরো।"

বাণী বলল, "এবার সোজা যাও।"

কেওড়া বলল, "হেঁতালের ঝোপ বাঁয়ে রেখে সোজা চলো।"

গেমা বলল, "ওই তো নয়ন, বাঘঘুল্লির কাছাকাছি চলে এসেছ, আর একটু ভাই।"

নয়ন যেই বাঘঘুল্লির সামনে এল, দ্যাখে কী, ঝোপের পাশে বন আলো করে বসে আছে পরমাসুন্দরী এক বউ। পিঠময় ছড়ানো তার চুল। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে একমনে কী ভাবছে। মনে কোনও সুখ নেই। একটু দূরেই বসে আছে হলুদ-কালো ডোরাকাটা এক বাঘ। নয়নকে দেখে সেই বাঘ লেজ গুটিয়ে নিল। গুটিগুটি করে এগিয়ে এল বউটির কাছে। ওর চোখের আগুন গেল নিবে। গলার বুক-কাঁপানো আওয়াজ গেল ভুলে। পোষা কুকুরের মতন শুধু কুঁই কুঁই শব্দ করল কয়েকবার। নয়ন অবাক হয়ে দেখছিল। বউটি তাকাল তার দিকে, "তুমি কে?"

"আমি নয়ন।"

"এখানে তুমি এলে কী করে?"

"বা রে, নদীদিদিরা যে পথ চেনাল, গাছদাদারা সাহস দিল, পাখিভাইরা নিয়ে এল।"

"ইশ্, তবে তো ভারী মুশকিল হল," বউটির আলোমুখ কালো হল।

নয়ন প্রশ্ন করল, "এবার বলো তুমি কে?"

"আমি বনবিবি।"

"তুমিই বনবিবি!" নয়ন তীর-ধনুক এবার কাঁধে ফেলল। চোখের আগুন নিবে গেল। ভক্তিতে মন নরম হল। সে প্রণাম করল। তারপর আসল কথাটা জিজ্ঞেস করল, "এখন বলো, আমার বাবাকে কে মেরেছে?"

"তোমার বাবাকে তো চিনলাম না!"

"আমার বাবা সুবল বাওলে।"

বনবিবি খানিক সময় ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। ব্যাজার মুখে বললেন, "তুমি এসেছ এখানে, এই গভীর বনে বাপের খোঁজ নিতে?"

"আমি এসেছি বাবাকে মারার শোধ তুলতে," বলেই সে তীর-ধনুক ফের হাতে নিল। চোখে আবার আগুন জ্বলল।

বনবিবি তো প্রমাদ গুনলেন। বনের পশুরা সব তটস্থ। বাঘের চোখে ভয়। ওই বুঝি তীর এসে তার বুকে বেঁধে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। বনবিবি পড়েছেন ফাঁপরে। এখন তিনি কী করেন! নয়নকে যে নদী গাছ পাখি সব্বাই ভালবেসেছে। বনের পশুরা তাই ওকে কিচ্ছু করতে পারবে না। তিনি এবার হাসলেন। হাসিতে তাঁর মুক্তো ঝরল। বললেন, "শোনো নয়ন, তোমার বাবা ছিল এক মস্ত বাওলে। বাওলে হয়েও সে করল এক মহাভুল। জঙ্গলেরও হরেক নিয়ম। সেই নিয়ম ভাঙলে কারও রেহাই নেই। তোমার বাবা তো মাটিতে পা দিল। গেমা গাছের পাতা নিল। গাছের গোড়ায় বসল উবু হয়ে। সেই পাতায় মাটি উচ্ছুগ্যু করল। সেই মাটি দিল সবার গলায় মাথায়। সেই মাটিতে কেউ ঘা দিতে পারে না। শুধু নিজের শিরে নিতেই করল ভুল। আর সেই ভুলেরই শিকার হল তোমার বাপ।"

শুনতে শুনতে নয়নের বুকে জোয়ার এল। জলের ভারে চোখের পাতা ভারী হল। কথা বলতে কী যে কষ্ট। বলল, "জানো গো মা-বনবিবি, বাবার দুঃখে ঘর আঁধার হয়ে গেছে। মা গেল মহাজনের ঘরে কাজ নিতে। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাই না। তাই এসেছি এর শোধ নিতে। এখন বলে দাও, কে খেয়েছে আমার বাপকে।"

"যে খেয়েছে সে তো তোমার সামনেই আছে বসে।"

"তবে রে," বলেই সে তীর-ধনুকে টঙ্কার দিল।

বাঘ এবার উঠে দাঁড়াল। নরম গলায় বলতে লাগল, "মারতে চাও, মারো। তবে আমার কিছু কথা আছে।"

"বলো বলো, তাড়াতাড়ি সব বলে ফ্যালো।"

বাঘ বলল, "দোষ করলে শাস্তি দিও, নইলে আমায় ছেড়ে দিও।"

"তোমার কথা তো শুনি আগে!"

বাঘ গলা-খাঁকারি দিল। তারপর উকিলের মতন বলতে লাগল, "কথাটা ভাল করে ভেবে দেখো নয়ন, আমরা খিদে পেলেই শুধু খাই। নইলে কাউকে কিছু করি না তখন বরং মনের সুখে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। বেঁচে থাকার অধিকার তো সবারই আছে নয়ন। খিদে পেলে তুমি খাও না?"

নয়ন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, খাই তো!"

বাঘ বলল, "তবে? তা হলে সত্যি কথাটা শোনো, তোমার বাপ তো বনে ঢুকল দলবল নিয়ে, আমিও তক্কে-তক্কে ছিলাম। পেটে তখন খিদের আগুন। মা-বনবিবির মুখেই তো সব শুনলে। খুঁত পেয়ে তোমার বাপকেই নিলাম খেয়ে। তখন তো আর জানি না এর জন্যে তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে! এখন তুমিই বলো, এতে আমার দোষটা কোথায়? তা ছাড়া আরও এক কথা, তোমরা খাও, খাওয়ার পরে কত কী পড়ে থাকে। দরকার নেই, তবু জমাও আর জমাও। আমরা কিন্তু তা করি না নয়ন।"

নয়নের মন একটু নরম হল, বলল, "আমার বাবা কিন্তু অভাবের জ্বালাতেই ছুটে-ছুটে আসত বনে।"

"ভুল করত। কেন তোমরা আমাদের এখানে আসবে? তোমাদের অভাব তো তোমরাই করেছ। তোমাদের একদল

শুধু দিনের পর দিন দরকার ছাড়া অঢেল খাবার জমিয়েছে। জমিয়ে জমিয়ে পাহাড় বানিয়েছে। তাই তো আরেক দলের পেটে টান পড়েছে ! তাদের কাছেই তো তোমার বাপ দুঃখের কথা বলতে পারত। খাবার চেয়ে নিতে পারত। পেটের জ্বালা ভুলতে পারত। কিন্তু তা না করে এখানে এল ছুটে। আসলে এখানে তো আমরা চট করে কিচ্ছু বলি না কাউকে, তাই। যত অত্যাচার, হম্বিতম্বি আমাদের ওপর। আমরা কিন্তু জঙ্গলের নিয়ম ভাঙি না। নিয়ম ভাঙার নেশাও নেই আমাদের কারও। নিয়ম শুধু তোমরাই ভাঙো। এবার বুঝলে তো নয়ন, এখানে সব সময়ই এক সমতা বজায় আছে। তা নষ্ট হওয়ার উপায় নেই। তোমরা এসেই সব ভণ্ডুল করো। আমরা তো তোমাদের ওখানে যাই না নয়ন, বরং তোমরাই আসো, এসে আমাদের মেরেধরে শেষ করো। আর আমরা যদি নেহাত বাঁচার তাগিদে তোমাদের কিছু একটা করি, তখনই সব রাগ এসে পড়ে আমাদের ওপর। কেন ? তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে নয়ন, সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ ?"

"কী ?" নয়ন যেন একটু একটু ওর কথার জালে জড়িয়ে যাচ্ছে।

"সেটা আরও মারাত্মক। ধরো, তোমরা এসে মেরে-মেরে আমাদের একেবারে নির্বংশই করে দিলে। তখন কী অবস্থাটা হবে, একবার ভেবে দেখেছ ?"

"না তো !"

"তবে সেই কথাটাই শোনো নয়ন। তখন বনের সুর কেটে যাবে। তার ছিঁড়ে যাবে। শেকলের একটা গিঁট ছিঁড়লে সবটাই যায় যেমন আলগা হয়ে, ঠিক তেমনি। আমরা সবাই মিলে এই সমতা বজায় রাখছি। একজনের ওপর আরেকজন নির্ভর করছি। এখন ভেবে দ্যাখো নয়ন, আমরা না থাকলে, আকাশ থেকে ঝরে পড়বে অভিশাপের আগুন। সেই আগুনে বন পুড়বে। তোমরাও শেষ হয়ে যাবে।"

নয়ন ভাবতে লাগল। তাই তো, কথাগুলো তো আর মিছে নয় ! অনেক ভেবেচিন্তে শেষে বলল, "যাও, তোমাকে এবার ছেড়ে দিলাম।"

"হুর্‌রে !" বাঘ তক্ষুনি এক ডিগবাজি খেল। পাখিরা গান ধরল। গাছেরা হেসে উঠল। বনবিবি খুশি হলেন। বনে খুশির জোয়ার উঠল। কারও মনে আর কোনও ভয় রইল না। ভালবাসার বান ডাকল। সবাই এসে নয়নকে ঘিরে ধরেছে। আদর করে কাছে টানল, "আজ তুমি আমাদের সবার অতিথি নয়ন।" মুখে-মুখে এক কথা। সবাই তাকে খেতে দিল। তারপর কত নাচানাচি, হাসাহাসি। কত হৈহৈ, রৈরৈ। বনে আজ মহোৎসবের ধুম পড়েছে।

এক সময় রাত পোহাল। ভোরের মুখ উঁকি মারল। নয়ন এবার ঘরে ফিরবে। সবারই মন ব্যাজার হল। নয়নকে যে ওরা সবাই ভালবেসে ফেলেছে। ওদের ছেড়ে যেতে নয়নের বুকও ব্যথায় মুচড়ে উঠছে। তবু ছেড়ে যেতে হবে। মা'র কথা খুব মনে পড়ছে। সবার চোখেই ছলছল। কাঁধে তীর-ধনুক ফেলে নয়ন চলেছে ঘরে ফিরে। ক'পা এগোতেই খচ করে তার পায়ে ফুটল কাঁটা। আর তো সে হাঁটতে পারে না। হাঁটতে গেলেই ব্যথা। এমন সময় এক বাঁদর ছুটে এল। ওর পা থেকে সে কাঁটাটা খুব সাবধানে তুলে আনল। কিন্তু রক্ত তো থামে না ! তক্ষুনি আরেক বাঁদর কিছু দুবেবাঘাস ছিঁড়ে নিয়ে এল। দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে তা নরম করল। তারপর সেই ঘাস নয়নের পায়ে চেপে ধরল। রক্ত ঝরা থেমে গেল। কিন্তু নয়নের হাঁটতে বড় কষ্ট, তা দেখে সেই বাঘেরও খুব দয়া হল। কাছে এগিয়ে এসে বলল, "তুমি আমার কাঁধে চড়ো নয়ন। অনেকটা পথ, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তুমি তা যেতে পারবে না।"

নয়ন আর কী করে ! সে বাঘের কাঁধে চড়ল। বাঘ তো চলল হেলেদুলে। যেতে যেতে হঠাৎ নয়নের মনে পড়ল, মাঝে-মাঝে বাবার সঙ্গে হাটে যেত সে। তখন তার পা আর চলত না, বাবা তখন তাকে কাঁধে তুলত। বাঘ তার বাবার কাজই করল আজ। নয়ন চোখ বুজল।

খানিক পরে বন পেরিয়ে ওরা নদীর ধারে এল। নয়নকে বিদায় জানাতে আজ সবাই এসেছে। পশুপাখি গাছগাছালি কেউ বাদ নেই। সবারই মন খারাপ। বনের অতিথি আজ ঘরে ফিরে যাচ্ছে। নয়ন গিয়ে নৌকোয় উঠল। ওরা তার দিকে অপলকে চেয়ে আছে। হাত নাড়ছে। বলছে, "আবার এসো নয়ন, আবার এসো। ভালবাসার দরজা পেরিয়ে সবাইকে আসতে বোলো। আমরা তোমাকে কক্ষনো ভুলব না, ভুলব না।"

নয়নও হাত নাড়ল। বলল, "আমারও তোমাদের কথা খুব মনে পড়বে।"

এমন সময় এক দমকা হাওয়া ছুটে এল বন থেকে। সেই হাওয়া তার উশকো চুলে বিলি কাটল। নরম স্নেহের এক ছোঁয়া লাগল। নয়ন চমকে উঠেছে। বাবাও তো ঘুমের সময় এমনি করে তার চুলে বিলি কাটত। তারপর গলা জড়িয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ত। একটা ছায়া সরে গেল। তার বাবা যেন শেষবারের মতন তাকে আদর করে গেল। তার কান্না পেল। বুক ফুলে ফুলে উঠল। চোখের পাতা ভিজল। বাবা তার এই বনেই পড়ে রইল।

নয়ন কাঁদছে। কাঁদছে গাছ, পশুপাখি, সবাই। চোখ মুছতে মুছতে সে নৌকোয় গিয়ে উঠল। পাল খাটাল। সেই পালে লাগল হাওয়া। ওরা তখনও হাত নাড়ছে। নয়নও হাত নাড়ল, বিদায়, বিদায়। হঠাৎ তার তীর-ধনুকের কথা মনে পড়ল। আর কী হবে এগুলো দিয়ে ! সে হঠাৎই তীর-ধনুকটা গাঙের জলে ফেলে দিল। ওগুলো তখন ভাসতে-ভাসতে চলল দূরে। অনেক দূরে।

ছবি : প্রবীর সেন

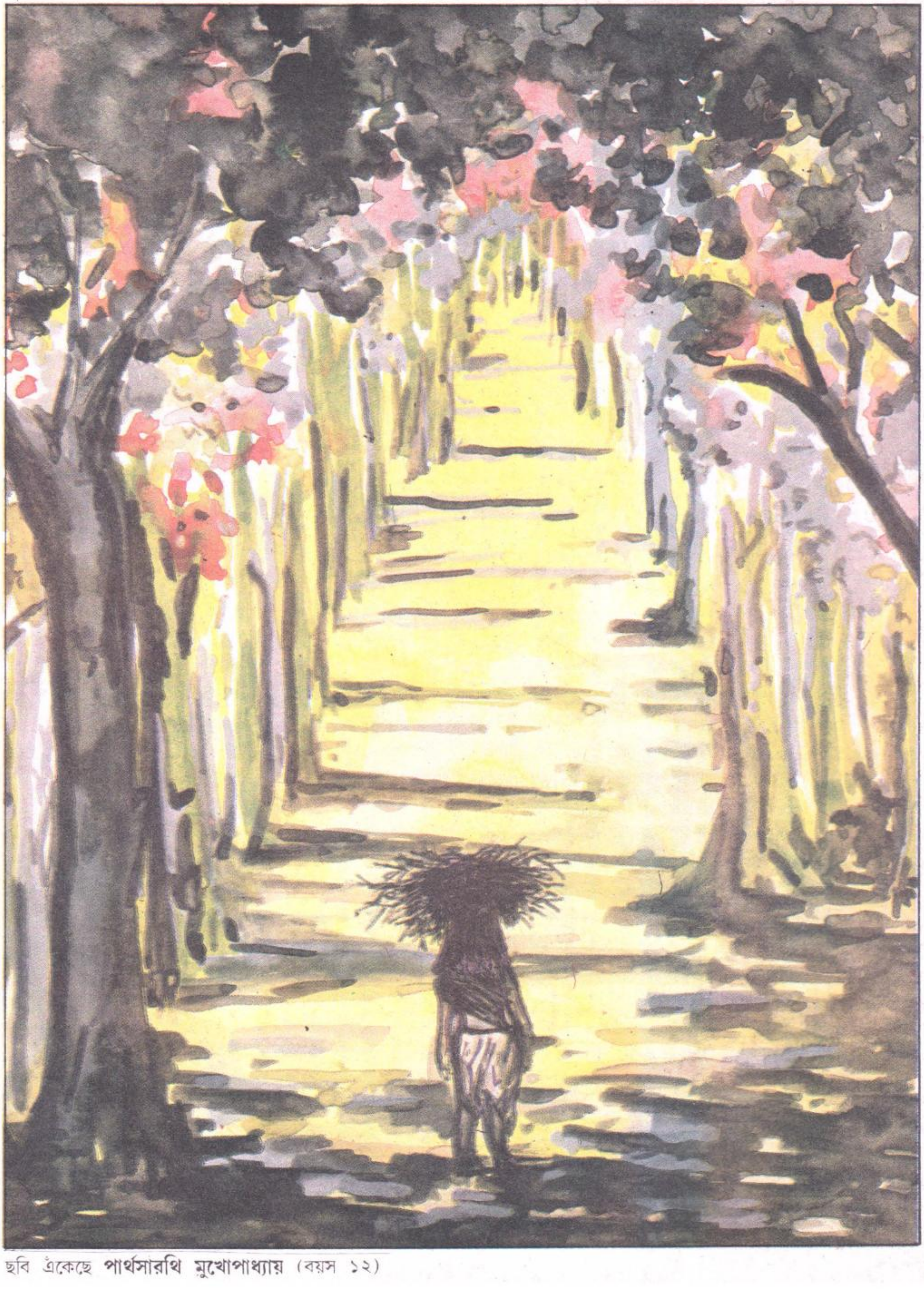

ছবি এঁকেছে **পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়** (বয়স ১২)

ছবি এঁকেছে **সারস্বত বসু** (বয়স ১১)

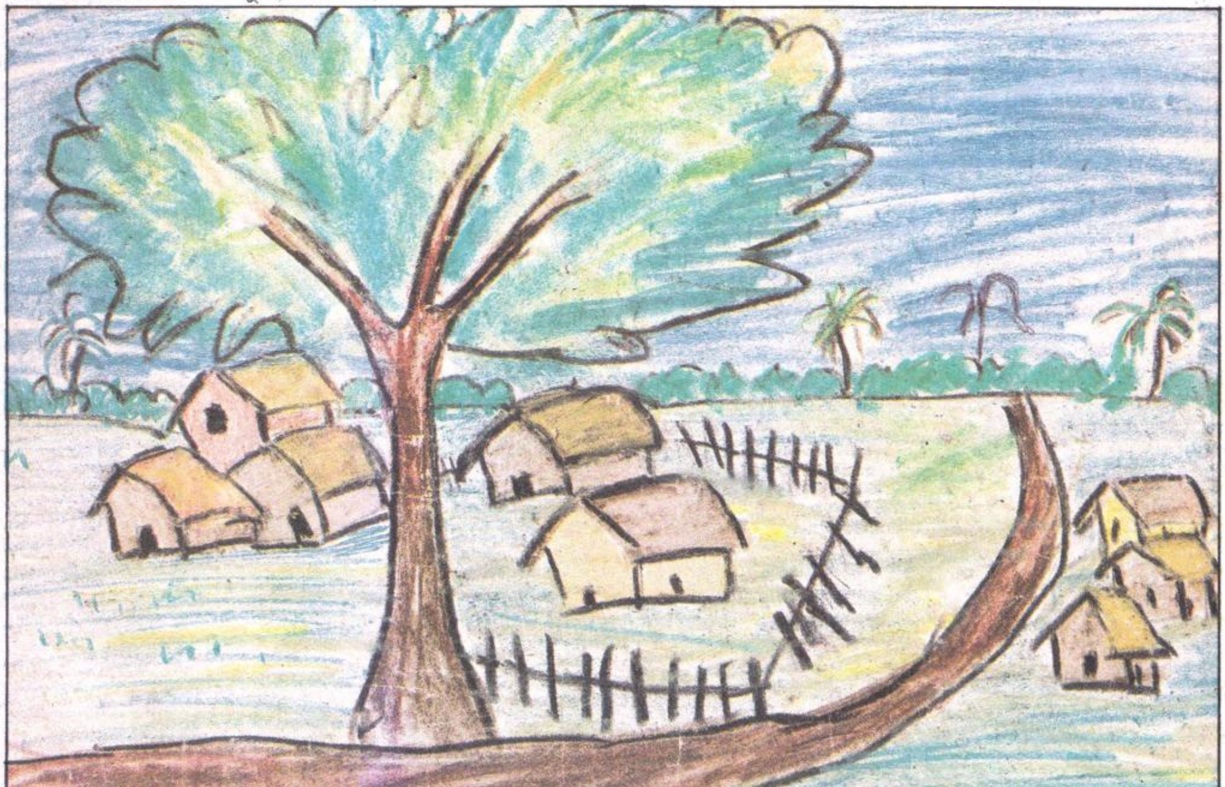

ছবি এঁকেছে **দামিনী মণ্ডল** (বয়স ১০)

উলটো ঝামেলা

তখন আমাদের বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে। তিনতলার ছাতের সিঁড়ি তৈরি হচ্ছে।

একদিন এক গাড়ি বালি এল। যে লোকটা বালি এনেছিল সে আমার দাদুর কাছে জানতে চাইল কোথায় সেটা ঢালা হবে।

দাদু বললেন,"আমাদের যাওয়া-আসার রাস্তায় ঢালো।"

এমন সময় ঠাকুমা এসে বললেন, "নানা, ওখানে ঢাললে যাতায়াতের অসুবিধে হবে। ও বরং অন্য কোথাও রাখুক।"

আমার দাদু এমনিতেই খুব রাগি, তার ওপর মেজাজটা সেদিন বোধহয় আরও খারাপ ছিল, ঠাকুমার কথায় চটে গিয়ে বললেন, "না, আমি বলছি, ও এখানেই ঢালবে।" বলেই লোকটাকে বললেন, "এইও! হাঁ করে দেখছ কী? ঢালো এখানে।"

ঠাকুমা অমনি কোমরে হাত দিয়ে গটমট করে এগিয়ে এসে বললেন, "খবর্দার। এখানে ওসব রাখা চলবে না।" ব্যস্। বেধে গেল দাদু-ঠাকুমার ঝগড়া।

দাদুও কোনও কথা শুনবেন না, আর ঠাকুমাও ছাড়বেন না।

সামান্য বালি নিয়ে এত ঝগড়া দেখে লোকটা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল। শেষকালে আস্তে আস্তে দাদুকে বলল, "বাবু, আপনারাই তাহলে ঝগড়া করে ঠিক করুন কোথায় ওটা রাখা হবে। আমি বরং যাই।" এই না বলেই লোকটা হন্‌হন করে চলে গেল।

ডালিয়া দাশগুপ্ত (বয়স ১৫)

তিন বন্ধু ও রাক্ষস

তিন বন্ধু একদিন বেড়াতে যাচ্ছে। যেতে যেতে হঠাৎ তারা রাক্ষসের চিৎকার শুনতে পেল। তারা দেখল, একটা রাক্ষস 'জল দাও জল দাও' বলে চিৎকার করছে। তিন বন্ধু তাদের ওয়াটার-বটল থেকে জল খেতে দিল রাক্ষসকে।

রাক্ষসের তেষ্টা মিটল। সে তখন খুশি হয়ে তাদের একটা কুলের আঁটি দিয়ে বলল, "এটা তোমাদের কাছে রাখো। বিপদে পড়লে এটা মাটিতে ঘষবে। ঘষলেই আমি হাজির হব।"

কিছুদিন পরে তিন বন্ধু ডাকাতের হাতে পড়ল। ডাকাতরা যেই ওদের মারতে যাবে অমনি এক বন্ধু কুলের আঁটি ঘষে দিল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস হাজির। রাক্ষস ডাকাতদের মেরে তিন বন্ধুকে বাঁচাল।

পরীক্ষিৎ চট্টরাজ (বয়স ৯)

মুখে আঙুল দিয়ে

আজ আমার ছোটকাকুর বিয়ে। সকাল থেকে গোটা বাড়ি জমজমাট। কী আনন্দ! কী হৈচৈ!

আমরা তিন বোন ঠিক করলাম সাদা জাপানি ফ্রক পরে সাজব। আমার মেজকাকুর ছেলে টুবলো বলল, "আমি মহাকাশচারী হব।" সে তাই হল। গ্যাগারিনের মতো পোশাক পরল। চোখে আবার কালো চশমা।

আমার মা জল-রঙের বালুচরি শাড়ি আর রুপোর গয়না পরলেন। আমার পিসি পরলেন টকটকে লাল বেনারসি।

শুধু মা, কাকিমা, পিসি কেন—বাবা-কাকুরা পর্যন্ত সাজগোজ করলেন।

আমার ছোটকাকুর কপালে চন্দনের টিপ আর মাথায় টোপর দেখে আমরা তিন বোন খুব হেসে উঠলাম। মা বললেন, "বিয়েবাড়িতে গিয়ে কেউ কিন্তু হাসাহাসি করবে না।"

আমরা সঙ্গে-সঙ্গে মুখে আঙুল দিলাম। বিয়েবাড়িতেও গেলাম সেইভাবে।

নতুন কাকিমা সেজেগুজে ছলছল চোখে বসেছিলেন, কিন্তু আমাদের দেখেই হেসে ফেললেন।

আমার ছোট বোন রম্যানি তখন বলল, "ভাগ্যিস আমরা মুখে আঙুল দিয়েছিলাম, নইলে নতুন কাকিমা কি আর হাসত?"

বিতস্তা ঘোষাল (বয়স ১২)

শুরু হল শার্লক হোমসের নতুন গল্প

নতুন চাকরি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই আমি প্যাডিংটন অঞ্চলে ডাক্তারি করতে শুরু করলুম। এই অঞ্চলে ডাঃ ফারকার প্র্যাকটিস করতেন। ডাঃ ফারকারের রীতিমত ভাল প্র্যাকটিস ছিল। ইদানীং তাঁর প্র্যাকটিস অবশ্য পড়ে গিয়েছিল। তার এক নম্বর কারণ হল ডাঃ ফারকারের বয়েস হয়েছে, আর দু'নম্বর কারণ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। ডাঃ ফারকার 'সেন্ট ভাইটাসেস ড্যান্স' গোছের স্নায়ু-রোগে বড্ডই কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে হয় যে, তাঁর রুগি কমে যাবার আসল কারণ এটাই। সাধারণ লোকে বোধহয় ভাবতে লাগল যে ডাক্তারবাবু যদি নিজের অসুখই না সারাতে পারেন তো অন্য লোকের অসুখ সারাবেন কী করে? আর সেইজন্যে ডাঃ ফারকারের অসুখ বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্র্যাকটিসও কমতে লাগল। ডাঃ ফারকারের জায়গায় আমি যখন এলুম তখন তাঁর আয় বছরে মাত্র তিনশো পাউণ্ড। অথচ গোড়ায়-গোড়ায় তাঁর আয় ছিল বছরে বারোশো পাউণ্ডেরও বেশি। তবে আমি ঘাবড়াইনি। আমার বয়েস কম আর আমি খাটতেও পারি খুব। আমার মনে ভরসা আছে যে, কিছুদিনের মধ্যেই আমি প্র্যাকটিস জমাতে পারব।

প্র্যাকটিস করতে গিয়ে প্রথম মাস-তিনেক আমার যাকে বলে দম ফেলবার সময় ছিল না। আর তাই আমি বেকার স্ট্রিটের দিকে যেতে পারিনি। শার্লক হোমস্রের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। শার্লক হোমস আবার মহা ঘরকুনো। কাজের জন্যে ছাড়া তাকে ঘর থেকে বেরোতে আমি কখনও দেখিনি। সেটা জুন মাসের কথা। ব্রেকফাস্ট সেরে আমি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের নুতন সংখ্যাটা পড়ছিলুম। এমন সময় সদর দরজার ঘন্টাটা বেজে উঠল। তার পরেই শার্লক হোমসের ভরাট গলার স্বর আমার কানে যেতেই রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোমস বললে, "ওয়াটসন, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে কী আনন্দই যে হচ্ছে, কী বলব। মিসেস ওয়াটসন আছেন কেমন? আমাদের সেই 'সাইন অব্ ফোর' এর ব্যাপারটার সব চুকে গেছে তো?"

হোমসের হাতটা আমার মুঠোয় জাপটে ধরে বললুম। "ধন্যবাদ। আমাদের খবর মোটামুটি ভাল।"

একটা রকিং চেয়ারে বসে হোমস বললে, "ডাক্তারি পেশার চাপে পড়ে তোমার গোয়েন্দাগিরির শখ একেবারে উবে যায়নি আশা করি।"

আমি বললুম, "ঠিক তার উলটো। কাল রাত্তিরেই আমি আমার পুরনো ডায়েরির পাতা উলটে-উলটে দেখে কেসগুলো কীভাবে সাজানো যায় তাই ভাবছিলুম।"

"তুমি কি তোমার ডায়েরি লেখা বন্ধ করে দিয়েছ?"

"না, মোটেই নয়। তোমার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করতে পেলে আমি আর কিছুই চাই না।"

"ধরো যদি ব্যাপারটা আজকেই হয়?"

"হ্যাঁ। আমি রাজি।"

"ধরো, যদি বার্মিংহাম অবধি যেতে হয়?"

"তুমি বললে আমি নিশ্চয়ই যাব।"

"তোমার প্র্যাকটিসের কী হবে?"

"কাছাকাছি আমার পরিচিত এক ডাক্তার আছেন। তিনি কোথাও গেলে আমি তাঁর রুগিদের দেখাশোনা করি। আমি বললে তিনি আমার রুগিদের চিকিৎসা করবেন।"

"বেশ, বেশ। খুব ভাল।" হোম্স চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমাকে খুব ভাল করে দেখতে লাগল। "কিছুদিন আগে তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল দেখছি। গরমকালে সর্দি লাগলে ভীষণ ভোগায়।"

"হ্যাঁ, খুব ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। গত সপ্তাহে তিনদিন ঘরবন্দী ছিলুম। কিন্তু অসুখের কোনও চিহ্নই আর আমার শরীরে আছে বলে আমার মনে হয় না।"

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক বলেছ। তোমাকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে!"

"তা হলে শরীর খারাপের খবর তুমি জানলে কী করে?"

"বন্ধু হে, তুমি তো আমার কাজের ধরনধারণ জানো।"

"তুমি অনুমানের ওপর ভর করে বললে?"

"নিশ্চয়ই।"

"কীভাবে অনুমান করলে?"

"তোমার চটির অবস্থা দেখে।"

হোমসের কথায় আমি আমার পেটেন্ট লেদারের নতুন চটির দিকে তাকালুম। "চটি দেখে কীভাবে অনুমান—" হোমস আমাকে চুপ করিয়ে দিলে।

হোমস বললে, "তোমার চটিজোড়া নতুন। মনে হয় অল্প কিছুদিন আগে কিনেছ। তোমার চটির সুকতলার ধারে-ধারে ঝলসানির দাগ দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে ভেবেছিলুম চটিটা ভিজে গিয়েছিল বলে আগুনের তাতে শুকোতে গিয়ে এই রকম হয়েছে। কিন্তু দেখলুম যে, চটির তলায় দোকানের ছাপ মারা পাতলা কাগজটা আটকে আছে। চটিটা যদি জলে ভিজে যেত তা হলে কাগজটা খুলে যেত। তা হলে তুমি নিশ্চয়ই আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে বসে ছিলে। আর যদিও এ বছর জুন মাসে বৃষ্টি অন্য বছরের তুলনায় বেশিই হচ্ছে, তা হলে সুস্থ শরীরে তুমি নিশ্চয়ই ওইভাবে বসে থাকতে না।"

হোমস যখন তার কোনও একটা সিদ্ধান্তের কারণগুলো বুঝিয়ে বলে, তখন মনে হয় সব ব্যাপারটাই সোজা। এর মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই। হোমস আমার মনের কথাটা টের পেয়েছিল বোধহয়।

অল্প একটু হেসে হোমস বললে, "ওয়াটসন, সব কথা খুলে বলে আমি আমার নিজেরই ক্ষতি করছি। লোকে কার্যকারণ সম্পর্কটা না ধরতে পারলে বেশি রকম সমীহ করে।" বুঝলুম হোমস মনে দুঃখ পেয়েছে। তারপর একটু থেমে বললে, "তা হলে তুমি বার্মিংহাম যাচ্ছ তো?"

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!

বোর্নভিটা — মল্টেড ব্রাউন পানীয় আহার, যাতে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ প্রস্তুত করেছে ক্যাডবেরি— ১০০ বছরেরও ওপর যারা পানীয় আহার তৈরীতে বিশেষজ্ঞ।

প্রতি কাপ দুধে, দুচামচ বোর্নভিটা মিশিয়ে খেলে, পরিবারের প্রত্যেকে পাবে পুষ্টি ও আস্বাদে ভরা এক পানীয়। বোর্নভিটা বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে দারুণ উপকারী। অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যে ওদের দিনে দুবার বোর্নভিটা দিন— আর লক্ষ্য করুন, শরীর বৃদ্ধির উপযোগী যথাযথ শক্তি পেয়ে ওরা কেমন তরতরিয়ে বাড়ছে!

বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীলা এক মা বলেন ঃ "আমার বাচ্চাদের দুধে বোর্নভিটা মিশিয়ে খাওয়াই বলে, ওরা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর শক্তি যথাযথভাবে পায় —তাইতো পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হবেই খাওয়াতে।"

এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ষ.
যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

OBM/5135/BEN

"নিশ্চয়ই । কিন্তু মামলাটা কিসের ?"

"ট্রেনে যেতে যেতে তোমাকে সব কথা খুলে বলব। আমার মক্কেল বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও।"

"এক মিনিট।" আমি আমার পাশের বাড়ির ভদ্রলোককে দেবার জন্যে একটা চিরকুট লিখে ফেললুম। তারপর দৌড়ে ওপরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে সব কথা বলে এলুম। আমি নেমে এসে দেখলুম, হোমস বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

পাশের বাড়ির দরজার পেতলের নেমপ্লেটটা দেখিয়ে হোমস বললে, "তোমার প্রতিবেশী একজন ডাক্তার।"

"হ্যাঁ। আমার মতো উনিও এখানে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন আর-একজনের জায়গায়।"

"যাঁর জায়গায় উনি এসেছেন তিনি কি পুরনো কোনও ডাক্তার ?"

"হ্যাঁ, আমি যার জায়গায় এসেছি তিনি আর সেই ভদ্রলোক একসঙ্গে এখানে ডাক্তার হয়ে আসেন। ওঁরা যখন এখানে আসেন তখন এদিকে লোকজনের বাস সবেমাত্র শুরু হয়েছে।"

"তুমিই জিতে গেছ। তুমি যাঁর জায়গায় এসেছ তাঁর প্র্যাকটিস বেশি ছিল।"

"আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তুমি জানলে কী করে ?"

"সিঁড়ির ধাপগুলো দেখে বন্ধু, স্রেফ সিঁড়ির ধাপগুলো দেখে। তোমার বাড়িতে ঢোকবার সিঁড়িগুলো এই বাড়ির সিঁড়ির চেয়ে অন্তত তিন ইঞ্চি বেশি ক্ষয়ে গেছে। যাই হোক, গাড়ির মধ্যে এই যে ভদ্রলোককে দেখছ, এর নাম মিঃ হল পাইক্রফট। ইনিই আমার মক্কেল। ওহে বাবু, গাড়িটা জোরে হাঁকাও দেখি, ট্রেন ছাড়তে বেশি দেরি নেই।"

গাড়ির ভেতরে একজন অল্পবয়েসী ভদ্রলোক বসে ছিলেন। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। গায়ের রঙ ধপধপে ফর্সা। মুখেচোখে সাদাসিধে নিরীহ ভাব। তাঁর মুখের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে ঠোঁটের ওপর খোঁচা-খোঁচা হলদে গোঁফ। ভদ্রলোক কালো স্যুট আর চকচকে টপ্‌হ্যাট পরে ছিলেন। চালাক-চতুর চটপটে কাজের লোক বললে এককথায় যা বোঝায় ভদ্রলোক তাইই। এঁদের সাধারণভাবে 'কক্‌নি' বলা হয়। কিন্তু আমি জানি যে, আমাদের সেনাবিভাগের সুনাম এই কক্‌নিদের জন্যেই। আর আমাদের দেশের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই তো কক্‌নি। এই ভদ্রলোকের গোলগাল লাল মুখের ভাবটা বেশ হাসিখুশি। তবে ঠোঁটের দু'পাশের ভাবটা দেখলে মনে হয় যেন এই কেঁদে ফেললেন বুঝি। সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের মুখের ভাবটা বেশ মজার। তবে ভদ্রলোকটি যে কেন শার্লক হোমসের কাছে এসেছেন, এ-কথাটা জানতে পারলুম ট্রেন ছাড়বার পর।

আমরা একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে বসলুম। হোমস বললে, "আমাদের বার্মিংহাম পৌঁছতে ঠিক এক ঘন্টা দশ মিনিট সময় লাগবে। মিঃ হল পাইক্রফট, আপনি আপনার যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শুনিয়েছেন সেই কথা যদি আমার বন্ধুকে আর একবার শোনান তো বড় ভাল হয়। আপনি কোনও কিছুই বাদ দেবেন না, বরং যদি আর কোনও কথা মনে পড়ে যায় সেটাও জুড়ে দেবেন। সব ঘটনা আর একবার আগাগোড়া শুনলে আমার কাজেরও সুবিধে হবে।...বুঝলে ওয়াটসন, এটা এমনই একটা ঘটনা যে, এর মধ্যে অনেক সমস্যা থাকতে পারে আবার কোনও সমস্যা নাও থাকতে পারে। তবে যে ধরনের উদ্ভট ব্যাপার আমরা পছন্দ করি এটা সেই ধরনের ব্যাপার। আচ্ছা মিঃ পাইক্রফট, আপনি শুরু করুন।"

আমার দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে ভদ্রলোকটি নিজের কথা বলতে লাগলেন।

"সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এ ব্যাপারে আমি সাঙ্ঘাতিকরকম বোকামি করে ফেলেছি কি না তা বুঝতে পারছি না। হয়তো ব্যাপারটা সে রকম কিছু নয় আর আমিও

কিছু বেঠিক কাজ করিনি। কিন্তু আমার যদি চাকরিটা যায় আর তার বদলে কিছুই না পাই তা হলে বুঝব যে, আমার চেয়ে আহাম্মক এ দেশে আর কেউ নেই। ডাঃ ওয়াটসন, আমি গল্প ভাল বলতে পারি না। তাই ঘটনা যা ঘটেছে সেটা আপনাকে সাদাসিধে ভাবে বলছি।

"আমি ড্রেপারস্ গার্ডেনসের কক্সটন অ্যাণ্ড উডহাউসের আপিসে চাকরি করতুম। এ বছরের গোড়াতে ভেনেজুয়েলায় বেশ কিছু টাকা লগ্নি করে এবং সেই টাকা লোকসান করে আমাদের কোম্পানির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি ওখানে পাঁচবছর চাকরি করেছি। কক্সটনসাহেব আমাকে একটা খুব ভাল সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। কিন্তু হলে কী হবে. আপিস একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

"আমরা সাতাশজন কেরানি বেকার হয়ে গেলুম। আমি এখানে-ওখানে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলুম। আমার মতো আরও অনেক লোক বেকার। কোথাও কোনও আশার আলো নজরে পড়ছিল না। আমি কক্সটন অ্যাণ্ড উডহাউস থেকে সপ্তাহে তিন পাউণ্ড মাইনে পেতুম। আমি তার থেকে প্রায় সত্তর পাউণ্ড জমিয়ে ছিলুম। এক সময় সেই জমানো টাকা সব খরচ হয়ে গেল। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ডাকে যে দরখাস্ত পাঠাব সে উপায়ও রইল না। ডাকটিকিট কেনবারও পয়সা নেই। আপিসপাড়ায় হেঁটে-হেঁটে জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেল। কিন্তু কোথায় চাকরি!

"শেষে একদিন লম্বার্ড স্ট্রিটের স্টকব্রোকার কোম্পানি 'মসন অ্যাণ্ড উইলিয়ামস'-এ একটা চাকরির সন্ধান পেলুম। আপনারা জানেন কি না জানি না, এই মসন অ্যাণ্ড উইলিয়ামস খুব নামজাদা কোম্পানি। লণ্ডনের বোধহয় সবচেয়ে ধনী কোম্পানি। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, ডাক-মারফত দরখাস্ত পাঠাতে। আমি তো কোনওরকমে ডাকটিকিট জোগাড় করে সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলুম। তবে চাকরিটা যে পাব এমন কোনও আশা মনের মধ্যে ছিল না। কী আশ্চর্য, সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর এল। আমাকে পরের সোমবার আপিসে গিয়ে দেখা করতে হবে। যদি অন্য কোনও বাধা বিঘ্ন না হয় তো ওইদিনই আমাকে চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। কীভাবে যে এই চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটা হয়, তা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আমি এমনও শুনেছি যে, আপিসের বড়-কর্তা নাকি ডাঁই-করা আবেদনপত্রগুলো থেকে চোখ বন্ধ করে একটা তুলে নেন আর তারই চাকরি হয়। সে-কথা যাক। আমার খুবই আনন্দ হল এই ভেবে যে, এতদিন পরে আমার সামনে আবার একটা সুযোগ এল। মাইনেও বেড়ে গেল সপ্তাহে এক পাউণ্ড করে। আর কাজ কক্সটনের ওখানে যা করতুম, তাই-ই।

"এইবার আপনাকে যা বলব তা শুনে আপনিও খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আমি হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে পটারস টেরেসের সতেরো নম্বর বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। যেদিন চাকরির ব্যাপারটা পাকপাকি হয়ে গেল সেদিন সন্ধেবেলায় ঘরে বেশ আরাম করে বসে পাইপ খাচ্ছিলুম। মনটাও বেশ খুশি-খুশি ছিল। হঠাৎ আমার বাড়িওয়ালি একটা কার্ড নিয়ে এসে হাজির হলেন। কার্ডের ওপরে লেখা ছিল: 'আর্থার পিনার, ফাইনানসিয়াল এজেন্ট'। এই নামের কোনও লোককে আমি চিনি না। এ-রকম কোনও নামও আমি আগে শুনিনি। তাই বুঝে উঠতে পারলুম না আমার সঙ্গে এই লোকটির কী দরকার থাকতে পারে। যাই হোক, আমি বাড়িওয়ালিকে বললুম লোকটিকে ওপরে আমার কাছে নিয়ে আসতে। যে লোকটি ঘরে ঢুকলেন তার গড়ন মাঝারি। মাথায় কালো চুল, দাড়ি কালো, চোখের তারাও বেশ কালো। নাকটা অনেকটা ইহুদিদের মতো। ভদ্রলোকের হাঁটাচলার ভঙ্গিটি তড়বড়ে। কথাগুলো কাটা-কাটা। ভদ্রলোক যেন সব সময়েই সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি বাজে কথার লোক নন। তাঁর সময়ের দাম আছে।

"তিনি বললেন, 'আপনিই মিঃ হল পাইক্রফট তো?'

"ভদ্রলোকের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

"'আপনি আগে কক্সটন অ্যাণ্ড উডহাউস কোম্পানিতে কাজ করতেন?'

"'হ্যাঁ।'

"'আপনি খুব সম্প্রতি মসনের আপিসে যোগ দিয়েছেন?'

"'হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন।'

"'বেশ।' তারপর একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কাজের কথা আমি নানান লোকের কাছে শুনেছি। সকলেই আপনার ভীষণরকম প্রশংসা করে। পারকারকে চেনেন তো, কক্সটনের ম্যানেজার ছিল? আপনার কথা বলতে শুরু করলে তাকে তো আর থামানো যায় না।'

"বুঝতেই পারছেন ডাঃ ওয়াটসন, এসব কথা শুনে আমার বেশ আনন্দই হল। আমি আপিসের কাজে কোনওদিন কোনওরকম গাফিলতি তো করিইনি, উলটে যতদূর সম্ভব ভাল করে কাজ করবার চেষ্টা করেছি। তবে আমাকে নিয়ে যে আপিসপাড়ায় এরকম আলোচনা হয় এ-কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

"'আপনার স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই খুব ভাল,' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"'মোটামুটি ভালই।'

"'আপনি তো এতদিন বেকার ছিলেন। শেয়ারবাজারের খোঁজখবর রাখেন কি?'

"'হ্যাঁ। স্টক এক্সচেঞ্জের পাতাটা রোজ সকালে পড়ি।'

"'ঠিক। একেই বলে কাজের লোক। এ-ধরনের লোকেরাই জীবনে বড় হয়। আমি যদি আপনাকে দু-চারটে প্রশ্ন করি, রাগ করবেন না তো? আচ্ছা বলুন তো দেখি, আয়ারশায়ারের কী দর?'

"'একশো পাঁচ থেকে একশো সওয়া-পাঁচ।'

"'আর নিউজিল্যাণ্ড কনসলিডেটের?'

"'একশো চার।'

"'আচ্ছা, ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলসের?'

"'সাত থেকে সাড়ে-সাত।'

"দু'হাত ছুঁড়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'চমৎকার। আমি যা শুনেছিলুম তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বাপু হে, বাপু হে মসনের আপিসে কেরানি হবার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি।'

(ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

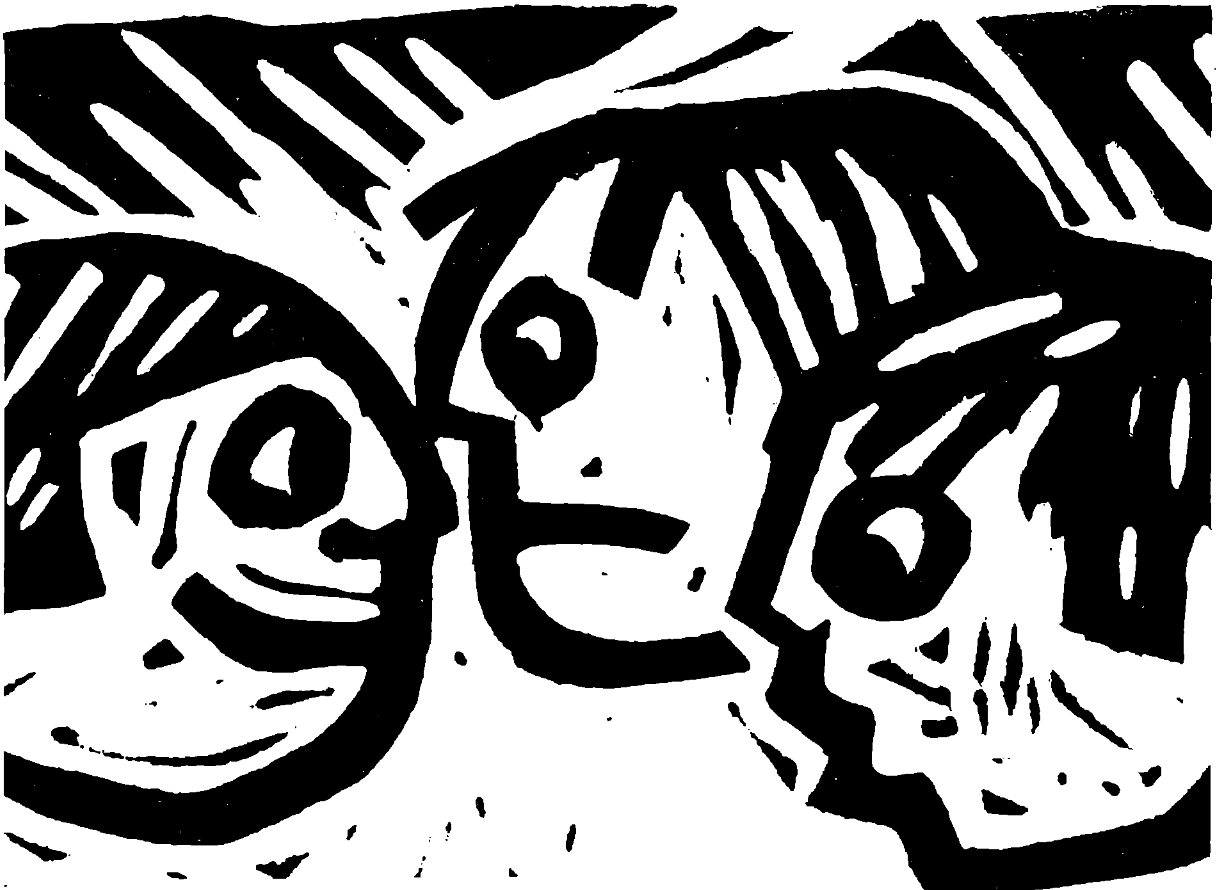

তিন ভূত এক মোক্তার

মিলন গঙ্গোপাধ্যায়

এ বছরও কাছারি ময়দানে সার্কাসের তাঁবু পাতা হয়েছে। গ্রেট ইন্ডিয়া সার্কাস। ভেতরে চলছে সার্কাস, বাইরে বসেছে মেলা। এ যেন রথ দেখা আর কলা বেচা। গোটাকয়েক টাকা জোগাড় করে দলে দলে সাইকেলে আর সাইকেলভ্যানে চেপে হাজির হচ্ছে। কলাপাতায় চার চামচ ঘুঘনি, একটুকরো নারকেল পাতা। গরম-গরম পরোটা, ডাল। রঙিন জলের শরবত। আইসক্রিম কুলফি মালাই। তালপাতার টুপি, আড়বাঁশি, মজাদার মুখোশ, তাও আছে। বাদামভাজা, হুড়মুভাজা, কটকটি, এসব যদিও গ্রামের হাটেই পাওয়া যায় এখানেও পাওয়া যাচ্ছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে মানুষের জটলা। গত বছরের জোকার থেকে শুরু করে বাঘ, হাতি, বানর, টিয়া সবকিছুর তুলনা চলছে এ-বছরের সঙ্গে। কারণ ইতিমধ্যে অনেকেরই একবার দুবার দেখা হয়ে গেছে। যারা এখনও দ্যাখেনি তারা হাঁ করে শুনছে বা গিলছে এবং অপেক্ষা করে আছে সেই ছোট্ট জোকারটার জন্য। সার্কাস শুরুর আধ ঘন্টা আগে হাতজোড় করে মাথা দুলিয়ে দু'পায়ে তালি বাজিয়ে তাঁবুর সামনে এসে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাবে। তখন সবাই পিলপিল করে তাঁবুর ভেতর চলে যাবে। যাওয়া হবে না বা যাওয়ার উপায় নেই তেলিয়াগ্রামের তিন মানিক ভুতো, ভূষণ, ভুবনের। অন্য বছর এ-সময়ে এর কলা ওর কুমড়ো তার কপি চুরি করে গোলাবাড়ি, দত্তপুকুর হাটে বিক্রি করে বারকয়েক সার্কাস দেখে ভাজাভুজি খেয়েও দু-চারটাকা পুঁজি করে ফেলে। কিন্তু এ-বছর এক ল্যাটা হয়েছে। শচীন-মোক্তারের ছেলে জগা সার্কাসের তাঁবুর পাশে সাইকেল রাখার জায়গা ইজারা নিয়েছে। এখন পাহারাদার চাই। কর্মঠ এবং বিশ্বাসী লোক চাই। সাইকেল পর পর সাজাও, গলায় একটা নম্বর ঝোলাও, একটা ডুপ্লিকেট দাও মালিককে। সার্কাস শেষ হলে মিলিয়ে মিলিয়ে ফেরত দাও। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত চোখ মেলে বসে থাকো। আট টাকা মজুরি। এই কাজের জন্য জগা যখন হন্যে হয়ে লোক খুঁজছে তখন শচীন-মোক্তার গায়ের কোট খুলতে খুলতে বললেন, "বিশ্বাসী লোক আমার হাতে আছে। কিস্‌সু চিন্তা নেই।" পরদিন সকালে যখন তিন মানিক ভুতো, ভূষণ, ভুবনকে হাজির করালেন, তখন জগার মাথায় হাত। তার মা পোড়াকাঠ নিয়ে ছুটে এলেন। "পুকুরপাড়ের কলার কাঁদি, কলপাড়ের এঁটো বাসন, ঠাকুরঘরের বাতাসা পর্যন্ত চুরি করেছে। এরা বিশ্বাসী ?"

তিন মানিক তখন মোক্তারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। জগা রাগে কাঁপছে, কিন্তু বাবার ভয়ে কিছু

বলতে পারে না। ফৌজদারি মামলায় শচীন-মোক্তারের যেমন নামডাক, তেমন উপার্জন। কাউকে জেল খাটাচ্ছেন কাউকে বেকসুর খালাস করে আনছেন। এখন এই তিনটে ছিঁচকে চোরকে বিশ্বাসী এবং কর্মঠ প্রমাণ করতে পারবেন না?

সেই সাত-সকালে ফতুয়া, লুঙ্গি আর চপ্পল পরে তিন মানিককে খুঁজেপেতে আনতে গিয়েছিলেন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করে আনতে আনতে কষ্টও কম হয়নি। এখন আবার যদি তাদের হয়ে বিনে পয়সায় আর্গুমেন্ট করতে হয় কার না মেজাজ বিগড়ে যায়! কিন্তু শচীন-মোক্তার ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। ফতুয়ার সামনের দুটো পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে কোমর বেঁকিয়ে মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে প্রথম যুক্তি পেশ করলেন, "মানুষের অতীত কর্মের কোনও বিচার করার এক্তিয়ার কী আমাদের আছে মি লর্ড..."

সামনে দাঁড়িয়ে হাতুড়ির বদলে পোড়াকাঠ হাতে তাঁর গিন্নি। কাঠটা রান্নাঘরের কানাচে ছুঁড়ে দিয়ে সজোরে হেসে উঠলেন। এক যুক্তিতেই আসামি খালাস। এর নাম শচীন-মোক্তার।

তিন মানিক বহাল হল। কিন্তু তাদের হাল দেখলে দুঃখ হয়। দুপুর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এন্‌গেজ্‌ড। দিনভর যাদের হেঁটে চলে বেড়ানো অভ্যেস, তারা এভাবে আটকা থাকতে পারে? ভুবন দেয় ভূষণের দোষ, ভূষণ দেয় ভুতোর দোষ। ভুবনকে কেউ দোষ দিতে সাহস পায় না। সে বয়সে বড়, বুদ্ধিতে দড়। দু'জনের অভিভাবক।

তাঁবুর ভেতর এখন নিশ্চয়ই কোনও জমাটি খেলা চলছে। অর্কেস্ট্রায় বাজছে মন-ভোলানো সুর। ভুবন কটমটিয়ে তাকাল ভূষণের দিকে। ভূষণ তাকাল ভুতোর দিকে। ভুতো এখন কী করে? সে বয়সে সবার ছোট। একটা আইসক্রিম চুষছে। মোলায়েম চোখে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে।

ভুবন ভাবে, যত দোষ ওই ভুতোটার। শচীন-মোক্তারকে খুশি করবার জন্য আগ বাড়িয়ে কথা দিয়েছে। যদিও শচীন-মোক্তারকে খুশি না করলে তাদের ভালমন্দ দেখার আর কে আছে? সেবার নাটু পালের রেশনের দোকানে চুরি করতে গিয়ে যা বিপদ। আসলে দোকানে তখন ভিড় থিকথিক করছিল। নাটু পাল টাকা পয়সা গুনে-গুনে ক্যাশবাক্সে পুরছে। আড়চোখে মালপত্র মাপা দেখছে। কম হয় হোক, যেন একদানা বেশি চলে না যায়। দুজন কর্মচারী কার্ড দেখে দেখে স্লিপ লিখছে, দাগ মারছে। সেখানে ভিড়ে ঠাসাঠাসি। ভুতো ভালমানুষের মতো গমের বস্তার ওপর বসে পা দোলাচ্ছে আর গমের দানা মুখে দিচ্ছে। আসলে চারদিক লক্ষ রাখছে।

ভূষণ আর ভুবন দোকানের পেছনের টিনের বেড়া ফাঁক করে গমের বস্তার মুখ খুলে ফেলেছে। ভূষণের ইচ্ছা গামছায় বেঁধে নেয়। ভুবন কটমট করে তাকায়। ধমক মারে, "নজরটা একটু বড় কর। জন্মকাল থেকে ছিঁচকে চোর থেকে যাবি? এর পর বস্তাসমেত মাল সরাতে পারবি? নে, থলেটা পাত।"

ঝুরঝুর বালির মতো পড়ছিল ভালই। লোকজনের কথা-কাটাকাটি, চেঁচামেচি চলছে সামনের দিকে। সেখানে সিগন্যাল দেওয়ার জন্য বসে আছে ভুতো। তার এখনও হাতটা পাকেনি, মনটাও পোক্ত হয়নি। আর বুকটা এমন বেয়াড়া যে দুমদাম আওয়াজ তুলে দুর্বল করে দেয়। হাঁটুতে জোর থাকে না। গা-হাত-পা কাঁপে, কানের পাতাও কাঁপে। কাঁপুনি যদি থামে, চোখ দুটো চলে যায় অকুস্থলে। ভুতো একটু অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করে। ভালমন্দ কথা চিন্তা করে। কিন্তু এই ভূষণ আর ভুবনের পাল্লায় পড়ে ভালমন্দ কথা বলতে কার বাগানে কলার কাঁদি, কার খেতে পটল, কার গাছে ঝুনো নারকেল কেমন হয়েছে এবং কী ভাবে তা হাতানো যায়—এই বুদ্ধি মাথায় চক্কর মারে।

পেছন থেকে শচীন-মোক্তার ডাকলেন, "কে? ছোটভূত?"

তিনি ওই নামেই ডাকেন। বড়, মেজো, ছোট—তিন ভূত। শচীন-মোক্তারের গলা শুনে ভুতো ধড়ফড়িয়ে বস্তা থেকে মাটিতে। সাপুড়ের সামনে সাপ যেমন লক্ষ্মীছেলের মতো ফোঁস-ফোঁস ভুলে গিয়ে ঝাঁপির মধ্যে ঘাপটি মারে, শচীন-মোক্তারকে দেখে ভুতোর সেই দশা। শুকনো মুখ। চোখ দুটো ফ্যাকাসে। ঠোঁট দুটো খড়খড়ে।

"কী! একলা যে? আর দুটো ভূত কোথায়?"

ভুতোর মুখে গমের দানা। এতক্ষণ চিবিয়ে-চিবিয়ে গাম হয়ে গেছে। বাব্‌লগাম চিউইংগামের মতো চিট-চিট করছে। থুক করে ফেলতে গেলে বিপত্তি।

"গম খাওয়া হচ্ছিল?" শচীন-মোক্তারের প্রশ্নে ভুতো একদিকে মাথা কাত করে বলে, "না, এমনি দু-চারটে দানা।"

"বড় ভূত, মেজো ভূত কোথায়?"

শচীন-মোক্তারের চোখ সাংঘাতিক চোখা, কান দুটো খাড়া, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তিন ভূতকে তিনি ভালভাবেই চেনেন, "আর বলতে হবে না, বুঝেছি।" ভুতো তার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে চায়। বিপদসঙ্কেত জানিয়ে দেয় গলার ঘড়ঘড় আওয়াজে।

"না, না, না। ওসব করে লাভ নেই। ওরা ভাগলেও তোর নিস্তার নেই। এদিকে আয়।" ভুতো চলল শচীন-মোক্তারের পেছনে পেছনে। না গেলে উপায় নেই। রেশনের লাইনে সবাই গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি করতে ব্যস্ত। দু'জনের কথা কারও কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

ভূষণ, ভুবন দুই শাকরেদ ততক্ষণে সিগন্যাল পেয়ে গা ঢাকা দিতে ব্যস্ত। দোকানের পেছনে এসে তাদের দেখা গেল না। শচীন-মোক্তার অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। দোকানের পেছনে পুকুর। পুকুরপাড়ে করমচাগাছের ঝোপ। ঝোপের কাছে যেতেই দুই ভূতের সঙ্গে দেখা। হাতে গম ভর্তি থলে, "পালাবার চেষ্টা করিসনে। মরবি।" শচীন-মোক্তারের হুকুম। হাতের মুঠোয় ধরা ভুতোর জামা।

নাটু পালের ছেলে হারু বাড়ি থেকে চা-জলখাবার নিয়ে দোকানে আসছিল। তিন ভূত এক মোক্তারকে করমচাগাছের ঝোপের পাশে দেখে দাঁড়াল। চোখ দুটো বড়-বড় করে তাকাল। তারপর জোরে পা চালাল। দোকানে পৌঁছে হাঁফাতে-হাঁফাতে বাবাকে বলতেই তিনি ধড়ফড় করে উঠতে গেলেন। হাঁটুতে বাত। কোমরে বাত। খিল ধরেছে। প্রেশার চড়চড় করে বাড়ছে। ক্যাশবাক্সে তালা লাগিয়ে তিন চেষ্টায় এর ওর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে পড়লেন। বাদবাকি সবাই ছুটল পুকুরপাড়ে।

ভুতো, ভূষণ ভুবন তখন শচীন-মোক্তারের জিম্মায়। কেউ গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না। নাটু পাল এসে পৌঁছলেন। হুঙ্কার ছাড়লেন, "আমার হাতে ছেড়ে দাও। তিনটের ডানা

ভেঙে দোব। ঠুঁটো জগন্নাথ করে তবে চা-জলখাবার খাব। পাজি, ছুঁচো, ধেড়ে ইঁদুর।"

নাটু পালের প্রায় স্ট্রোক। কথা বলতে পারছেন না। ঘামছেন। সবাই তখন কোথায় জল কোথায় পাখা—ছুটোছুটি।

"আমার জানটা অত ঠুনকো নয়। আজ ভূত ঝাড়িয়ে তবে অন্য কাজ।" নাটু পাল সুস্থ হয়ে পড়েছেন। শচীন-মোক্তার তাকে শান্ত হতে বললেন। কিন্তু নাটু পাল ফুঁসছেন, "মোক্তার! তুমি এদের বাঁচাবা?"

"না, না। বাঁচাব কেন, আমার কথাটা শোনো।"

"শুনবটা কী? প্রতি হপ্তায় মাল কম পড়ে। কর্মচারীদের মাইনে কাটি। আর এই তিন মিচকে মজা দ্যাখে। আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে বিকট চিৎকার, "আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।"

ভুতো, ভূষণ আর ভুবনের চোখ মাটির দিকে। হাত দু'খানা বুকের সঙ্গে ভাঁজ করা। পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটিতে আঁক কষছে।

যা করবার শচীন-মোক্তারই করবেন। তিনিই বাঁচান, তিনিই মারেন। জনতা এক-একবার ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। শচীন-মোক্তার ভরাট গলায় ধমক মারতেই সবাই চুপ, "তোমার দোকানের গম নিয়েছে? তুমি দেখেছ?" শচীন-মোক্তারের জেরা শুরু।

"আমার খোকা হারু দেখেছে। এই হেরো, বল।"

শচীন-মোক্তার আদালতের ঢঙে বললেন, "হারু, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না।" হারু মাথা নাড়ে। জনতা উৎকর্ণ হয়ে আছে। নাটু পালের আর তর সয় না। শচীন-মোক্তার প্রশ্ন করলেন, "তুমি এদের গম চুরি করতে দেখেছ?"

আমতা-আমতা করে হারু বলে, "না। আমি ঠিক নিতে দেখিনি, তবে..."

"তবে, তবে কী?" শচীন-মোক্তার ধমক মারলেন। জনতা শোরগোল শুরু করল। নাটু পাল হারুর ওপর রেগে মোক্তারের ওপর বিরক্ত হয়ে তিন ভূতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন। শচীন-মোক্তার বলেন, "তা হলে তোমার বিচারটাও আমরা সেরে ফেলি।"

"কীরকম, কীরকম?"

"তুমি রেশনের চাল, গম, চিনি সরিয়ে বেচতে গিয়ে ধরা পড়োনি?"

আগুনে জল পড়েছে। নাটু পাল চুপসে গেলেন। এর আগে শচীন-মোক্তারই বাঁচিয়েছিলেন। ডিলারশিপ ক্যানসেল হতে হতে হয়নি। অবিশ্যি তারপর থেকে সৎভাবে চালাচ্ছেন। শচীন-মোক্তার তা জানেন। আবার গোঁ, "এই পাজি তিনটে ফের যদি আমার দোকানে ঢোকে, রাগের মাথায় আমি বাটকারা ছুড়ে মারব, হ্যাঁ। রাগ হলে আমার একমাত্র ছেলে হেরোকেও ছাড়িনে। একবার ছাতাপেটা করেছিলাম, একবার চ্যাঙদোলা করে পুকুরে ফেলেছিলাম। কী হেরো, বল। নাকি শচীন-মোক্তারের জেরায় পড়ে বলবি—না, আমি ঠিক মনে করতে পারছিনে।"

কথাটা সত্যি। কিন্তু এত লোকের সামনে স্বীকার করা হারুর প্রেস্টিজের প্রশ্ন। তা ছাড়া বাবার বদ মেজাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে হারুর ক্ষোভ জমে আছে। ক্যাশবাক্স থেকে একবার পনেরো টাকা, অন্যবার বিশ টাকা হাতিয়েছিল। ক্লাবের ফুটবল খেলার জন্য। তার জন্য ছাতাপেটা করবে? চ্যাঙদোলা করে পুকুরে ফেলবে? ওই তো মধু সাহার ছেলে মানিক, ইস্কুলের সামনে যা বিক্রি হয় তাই কিনে খায়। পয়সা কোথায় পায়?

হারু উত্তর দিতে দেরি করছে দেখে নাটু পাল অধৈর্য হয়ে পড়লেন। মেজাজ চড়ে গেল, "পাজি, এত লোকের সামনে আমাকে অপদস্থ করা! বল তোকে ছাতাপেটা করেছিলাম কি না। নতুবা এখনই ছাতাপেটা করব।"

তিনি হাঁফাচ্ছেন, "এই সুক্কা! যা আড়ায় টাঙানো ছাতাটা আন। মজা দেখাচ্ছি।"

সুক্কা ছুটল ছাতা আনতে। সবাই হতভম্ব। শচীন-মোক্তারের মওকা। চোরকে বাঁচাতে গিয়ে যদি গৃহস্থের গলদ জানা যায়, সুবিধে অনেক। এই তিন ভূতের ওপর তার মায়া-মমতা খুবই। কাজকর্ম জুটিয়ে দেন, টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন, দু-চারটে উপদেশ দেন। কিছুতেই মতিগতি বদলাতে পারছেন না বুড়ো শালিখ ভুবনের জন্যে। সে বলে তার নাকি নষ্টচন্দ্রের দিন জন্ম। তাই মন না চাইলেও চুরি করে ফেলে। কিন্তু শচীন-মোক্তারের জেদ, এদের সুমতি ফিরিয়ে আনবেনই।

সুক্কা একটা ছাতা নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির। হতভম্ব জনগণ ফিসফিস করছে: হেরোটা যেন বাঁধা গোরু। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যা, পালিয়ে যা।

হারু গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ছলছল। লাল টসটসে মুখ। শচীন-মোক্তার এগিয়ে গিয়ে সুক্কার হাত থেকে ছাতাটা নিলেন। নাটু পাল বললেন, "না না, ওটা আমার হাতে দাও। প্রমাণটা সবার সমক্ষে দিয়ে দিই।"

"হ্যাঁ তোমার হাতেই দোব। কোমরে বাতের ব্যথা নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? এই নাও। একটু ঠেস দাও। আমিই বিচার করে দিচ্ছি।"

এ-প্রস্তাবে নাটু পাল মনে-মনে খুশি। হেরোকে ভালবাসেন খুবই। কপট গোঁ দেখিয়ে ছাতাটা নিলেন এবং কোমরে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। কোমর সত্যিই টনটন করছিল। শচীন-মোক্তারের প্রতি আস্থা বেড়ে গেল। মোক্তারের বিচারে তিন ভূতের সশ্রম সাজা। আজই নাটু পালের রেশনের দোকানের বেড়া মেরামত করতে হবে। তবে বিনে মজুরিতে নয়। চোরাই গম আগাম মঞ্জুর।

নাটু পাল বললেন, "শেষ পর্যন্ত লখিন্দরের বাসরঘর বানায় যদি! কালসাপের ভয়ে বাসর বানানো হল। লোহার ঘরেও পথ রেখেছিল। সাপ ঢুকে যা সব্বোনাশ করার করে গেল।"

সে দায়িত্ব আমার, শচীন-মোক্তার অভয় দিলেন, "আর আজ থেকে হারুর হাতখরচ খেলাধুলো সব মিলিয়ে মাসে বরাদ্দ বিশ টাকা।"

বিচারে সবাই খুশি। এত খুশি যে হাততালি দিতে লাগল।

ভুবনের চমক ভাঙল। সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে হাততালির

খই ফুটছে। কোন্ খেলা কিসের খেলা কে জানে! ধারেকাছে ভুতো, ভূষণ নেই। সে একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় ভুতো রেলিঙের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দিয়েছে। তন্ময় হয়ে আছে। ভূষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতি দেখছে। ওই হাতিটা একটু পরে একজনের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে। ভুবন ভাবল, ওফ্। লোকটার দেহে শক্তি কত! হাতির ওজন সহ্য করা চাট্টিখানি কথা! সেবার বাগজোলা হাট থেকে সাইকেল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে পচার কী অবস্থা। বুকের ওপর বাঁশ চাপিয়ে দু-দুটো জোয়ান নাচ করেছিল। তাতেই পচার বুকফাটা গোঙানি, চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়।

ভুবনের কষ্ট হল, এবং কৌতূহল। খেলাটা দেখবার প্রবল ইচ্ছায় সে ছটফট করছে। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। মেজাজ বিগড়ে গেল। তাকে সাইকেল পাহারায় রেখে দুজনে রোজ-রোজ এমন চলে যায়। আজ পর্যন্ত সে শুধু এর-ওর মুখে শুনেছে নানা মজার খেলার কথা। এই ভুতো, ভূষণ দুই ছিঁচকে উঁকি দিয়ে ঘাড় কাত করে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে খেলা দ্যাখে, ভাজাভুজি খেয়ে বেড়ায়। সে নড়তে পারে না। মেজাজ আরও চড়ে গেল। দেখাচ্ছি মজা। আজই একটা নতুন সাইকেল নিয়ে ভেগে যাব। বনবন চালিয়ে সোজা হাজির হব বামুনপাড়ায়। বরুণ দাসের কাছে দোকানে। কম করে দুশো টাকায় বেচব। জামা কিনব, প্যান্ট কিনব, না না, আগে পেট ভরে মাংস-রুটি খাব। একজোড়া জুতো কিনব। মা'র জন্য একটা থান কাপড় কিনব, না না, একজোড়া কিনব। মা যদি বলে, এত টাকা পেলি কোথায়! তখন যদি ধরা পড়ে যাই? পচার মতো সবাই মিলে বুকের ওপর...

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। ভুবনের স্বপ্ন ভেঙে গেল। বুকে হাত বোলাচ্ছে, "কী হে বড় ভূত, কী ভাবছিলি?" শচীন-মোক্তার হাজির। ভুবন চমকে উঠল। ধড়ফড়িয়ে পা ধরতে চায়। অপ্রকৃতিস্থ ভাবসাব। শচীন-মোক্তার ঝানু লোক। মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারেন। এখন যদি..."আর দুটো ভূত কোথায়?" মোক্তার চোখ ঘুরিয়ে বললেন।

ভুবন হাত দিয়ে দেখায়। মোক্তার হাঁকেন, "এই ছোট ভূত, মেজো ভূত।" তাদের চোখ যতই তাঁবুর মধ্যে থাক, মোক্তারের এই হাঁক তাদের সচকিত করল। পাঁই-পাঁই করে ছুটে এল। ধরা পড়ে লজ্জায় ভয়ে জড়োসড় ভাব। মোক্তারের চোখে-মুখে আত্মতৃপ্তির ভাব। বুড়ো শালিখ ভুবনকে পোষ মানাতে পেরেছেন। পকেট থেকে তিনখানা টিকিট বের করে বললেন, "পরের শো দেখবি। তোরা তিনজন।"

তিন ভূত আনন্দে আত্মহারা। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলে, "কিন্তু সাইকেল পাহারা দেবে কে?"

শচীন মোক্তারের আত্মতৃপ্তি আরও বেড়ে গেল। আনন্দে বুক ভরে গেল। বললেন, "কেন? আমি আর জগা।"

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

আজ প্রমিস ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার পরিবার চিরকালের ব্যবহৃত
লবঙ্গ তেলের
গুণ তো বুঝছেন!
প্রমিস
আপনিও দেখুন না ব্যবহার ক'রে?

প্রমিস
● দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
● মুখে আনে সুস্বাদ, আর
● দূর করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বিশ্বের স্বর্ণপদক বিজয়ী

সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি আর নির্মল
শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য

বালসারা উৎপাদন
CHAITRA-BLS-668 BEN

ডাক্তারবাবু বলছেন

গ্রীষ্মকালের খাওয়াদাওয়া

গ্রীষ্মকালে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু সাবধান থাকতে হবে। এই সময়ে বেশির ভাগ রোগ হয় খাবার আর জল থেকে। জলের কথা আগেই বলেছি। জল ফুটিয়ে খাবে আর বাইরের জল একদম খাবে না। নিমপাতা-ভাজা অথবা নিমবেগুন রোজ খাবার সময় খাবে। তেতো খেলে অন্ত্রে জীবাণুনাশক শক্তি বাড়ে আর অন্ত্রের জারক রসগুলি ভালভাবে নিঃসৃত হয়, ফলে সুন্দরভাবে হজম হয়।

তারপর ডাল ভাত। যারা রুটি খেতে ভালবাসে তারা ভাতের বদলে রুটি খাবে। ডাল প্রোটিন, তাই ডাল খেলে শরীর ভাল থাকবে। তারপর আলু দিয়ে যে তরকারি হবে সেই তরকারি খাবে। আলু যদি শক্ত থাকে তা হলে খেয়ো না। নরম, সেদ্ধ আলু খাবে, তাতে শরীরের এনার্জি বাড়বে।

যারা মাছ মাংস ডিম খাও, তারা তাই খাবে, তবে একটা কথা, মাছ বা মাংস যদি বাসী হয়, তা হলে খাবে না। যদি মুখে দিয়ে মনে হয় মাছ পচা তা হলেও খাবে না। ডিমও যদি পচা মনে হয়, খাবে না। বাসী নিরামিষ খাবারে যত-না রোগ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় বাসী আমিষ খাদ্যে।

সয়াবিনের তরকারি কিন্তু খুব উপকারী এবং এতে মাছ-মাংসের মতোই প্রোটিন থাকে। রোজ-রোজ মাছ-মাংস না খেয়ে সয়াবিনের তরকারি খেলে মুখের স্বাদও বদলাবে আর পুষ্টিও পাবে।

খাবার শেষে বাড়িতে তৈরি টক-দই খাবে। এতে সমস্ত খাবার খুব ভালভাবে হজম হয়ে যাবে।

গরমকালে ভাজাভুজি যত কম খাবে ততই ভাল। লক্ষ রাখবে, এই সময় যেন পেট খারাপ না হয়। যদি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তা হলে রোজ রাতে এক গ্লাস গরম দুধে দু'খানা হাতে-করা রুটি ছিঁড়ে ভিজিয়ে নিয়ে খাবে, তারপর দুধ চুমুক দিয়ে খাবে। দেখবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে গেছে।

রাস্তার খাবার কখনও খাবে না। রাস্তায় কাটা ফলও একদম খাবে না। রাস্তার ধুলো-বালিতে যে সব জীবাণু ঘুরে বেড়ায়, তা কাটা ফলে বাসা বাঁধে। আর পাকা ফলে মিষ্টি মানে গ্লুকোজ আছে। গ্লুকোজে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আর বেশি করে জীবাণু জন্মাতে পারে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

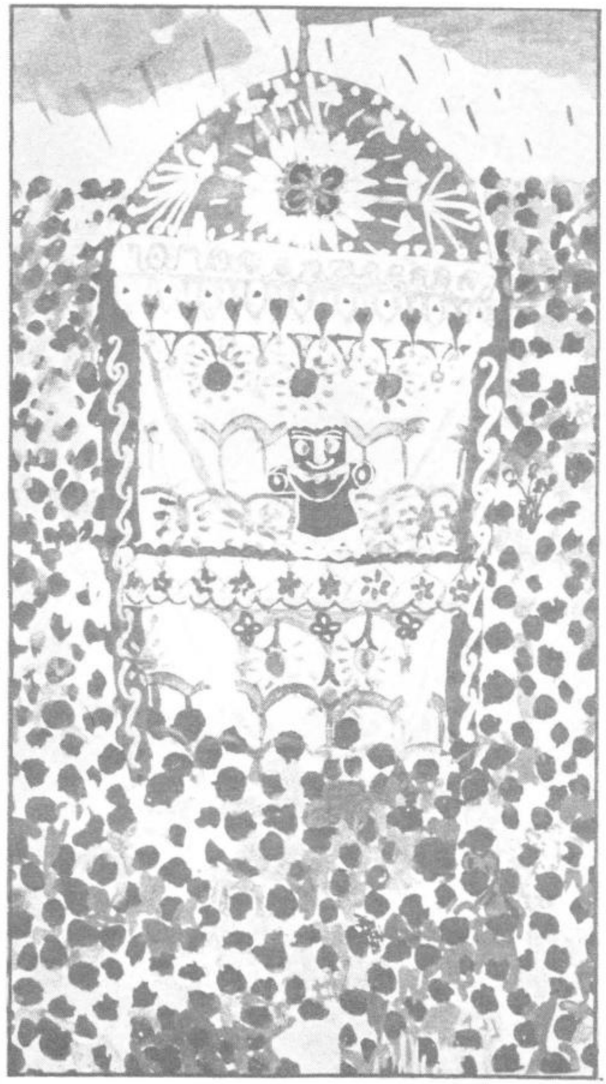

খেয়ালখুশির মেলা

কিছুদিন আগে কলকাতায় খুদে ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনী না একটা খেয়ালখুশির মেলা, যেদিকেই তাকাই রঙ আর রঙ। আট থেকে বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এইসব রঙবাহারি ছবি এত মন দিয়ে আর যত্ন করে এঁকেছে যে, দেখে তাক লেগে যায়। শিশুমনের হরেক জিজ্ঞাসা অর অফুরন্ত কৌতূহল, তাদের বিচিত্র সব ভাবনা এইসব ছবিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বড়রা ভাবতেই পারেন না, এমন সব তুচ্ছ হেলাফেলার বিষয়কেও তারা ছবিতে জ্যান্ত করে তুলেছে। শুধু কি ছবি, ছবির সঙ্গে হাতের কাজের নানা নমুনাও দেখলাম। শোলার ছড় কেটে কেউ তৈরি করেছে ফুল-নকশা, কেউ গাড়িঘোড়া, কেউ বা আবার ফুচকাওলা, ঠেলাওলা, এইসব। এই খুদে শিল্পীরা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সারদাদেবী শিশুচিত্র বিদ্যালয়ে আঁকা শেখে। এদের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলুম, এখানে ছোটরা শুধু যে ছবি আঁকাই শেখে, তা নয়, তারা যাতে সব বিষয়ে ছবির মতো সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, সে-শিক্ষাও দেওয়া হয়। বড় আনন্দের কথা, শুনে মন ভরে গেল।

সুনয়ন

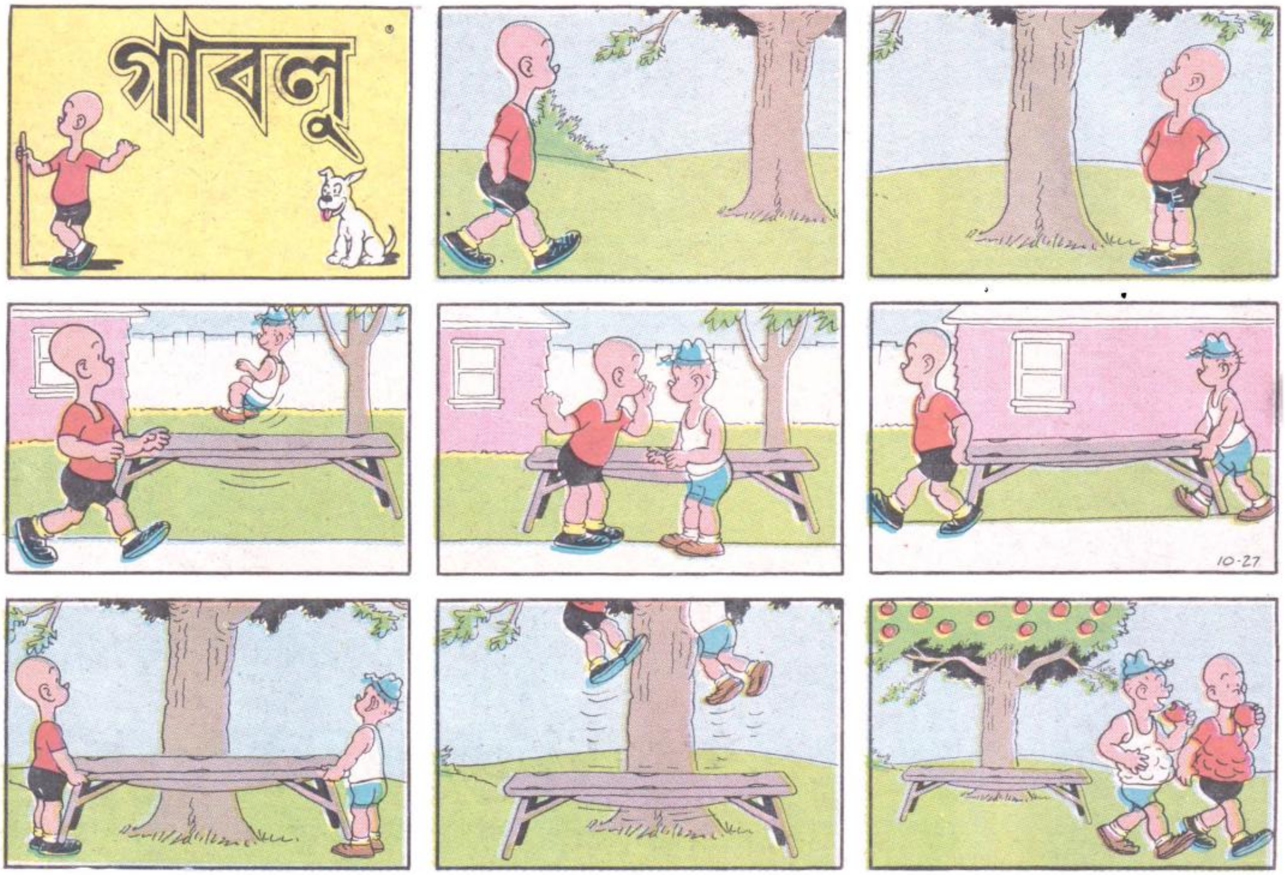

গাবলু
10-27

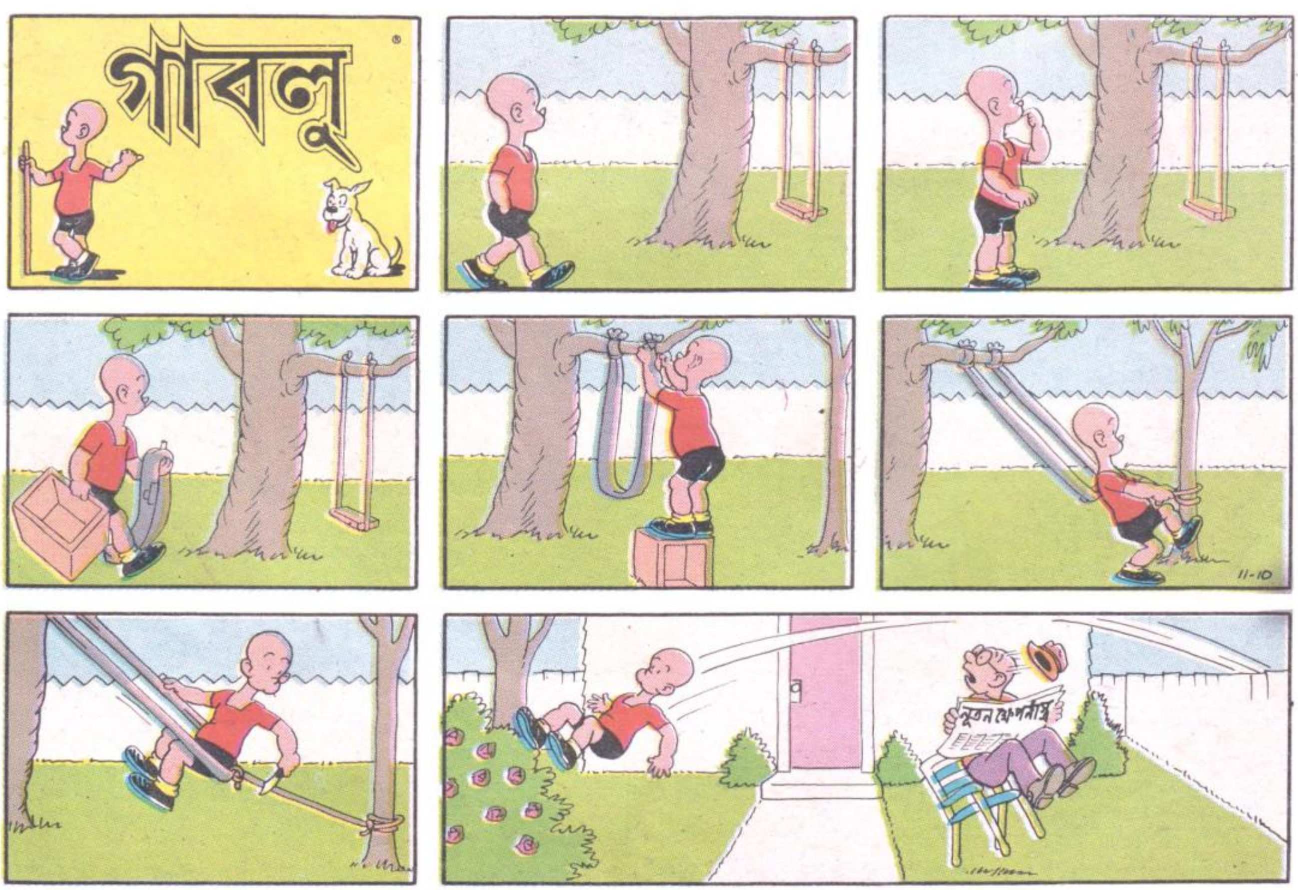

গাবলু
11-10
নূতন ক্ষেপনাস্ত্র

ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের গৌরব বাড়িয়েছেন
অধিনায়ক জেরেমি কোনি

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

শাবাশ নিউজিল্যাণ্ড

অজয় বর্মা

প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে, অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে একটা দ্বীপের নাম নিউজিল্যাণ্ড। এমন সময় ছিল, যখন পৃথিবীর সব ক'টা দেশই তাদের দ্বিতীয় দল নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলতে উৎসাহী হত। প্রথম দল খেললেই নিছক একপেশে খেলা! ব্যাপারটা বদলে গেছে। নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেটারদের আর মোটেই হেলাফেলা করা যাবে না। সব সেরা দলের বিরুদ্ধে কী তুলকালাম কাণ্ডই না করে চলেছেন তাঁরা! একেবারে হালফিলের কথাই ধরা যাক। উনিশশো পঁচাশির গোড়ায় তিনটে টেস্টের মধ্যে দুটোতে জিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে প্রথম সিরিজ জিতল নিউজিল্যাণ্ড। বছরের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে ২-১ টেস্টে সিরিজ জিতে রাবার নিয়ে দেশে ফিরলেন জেরেমি কোনি, চল্লিশ বছরের ইতিহাসে আর কোনও অধিনায়ক যা পারেননি! ছিয়াশি সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নিজেদের মাটিতেও আবার জয়জয়কার। শাবাশ নিউজিল্যাণ্ড!

এবারে ওয়েলিংটনের প্রথম টেস্ট বৃষ্টিতে ভেসে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ৪৩৫ রানের (চটপটে গ্রেগ ম্যাথুজ ১৩০, রিচি ৯২, ডেভিড বুন ৭০; হ্যাডলি ১১৬ রানে এবং ৪১ রানে কোনির তিনটে করে উইকেট) জবাবে ছ' উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডের ৩৭৯ রান (অপরাজিত কোনি ও হ্যাডলির ১০১ আর ৭২; ব্রুস রিড ১০৪ রানে তিন উইকেট)। ক্রাইস্টচার্চের টেস্টও ম্যাড়মেড়ে ড্র। অস্ট্রেলিয়া ৩৬৪ (বর্ডারের ঝকঝকে ১৪০, স্টিভ ওয়াগ ৭৪; দামাল হ্যাডলির ১১৬ রানে সাতটা উইকেট) এবং সাত উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ২১৯ রান (বর্ডার ফের ১১৪ নটআউট; অফস্পিনার জন ব্রেসওয়েলের ৭৭ রানে চারটে উইকেট)। নিউজিল্যাণ্ড ৩৩৯ (দুরন্ত মার্টিন ক্রো ১৩৭, কোনি ৯৮; রিগ ও ওয়াগের চারটে করে উইকেট, ৯০ আর ৫৬ রান দিয়ে) এবং এক উইকেটে ১৬ রান।

এই দুটো টেস্টে দুটো বড় ঘটনা ঘটল। একুশে ফেব্রুয়ারি, প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে রিচার্ড হ্যাডলি অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন অ্যালান বর্ডারকে এল· বি· ডব্লু· করে টেস্ট ক্রিকেটে ছ' নম্বর বোলার হিসেবে নিজের তিনশো উইকেট পূর্ণ করলেন, আর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে, আঠাশে ফেব্রুয়ারি বিকেলে বর্ডারসাহেব ৭৮ রানে পৌঁছে টেস্ট ক্রিকেটে ছ' হাজার ক্লাবের চোদ্দ নম্বর সভ্য হলেন।

অকল্যাণ্ডের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে নিউজিল্যাণ্ড তৃতীয় টেস্ট ও সিরিজ জিতল। বর্ডারের দলের ৩১৪ রানের

জেরেমি কোনি

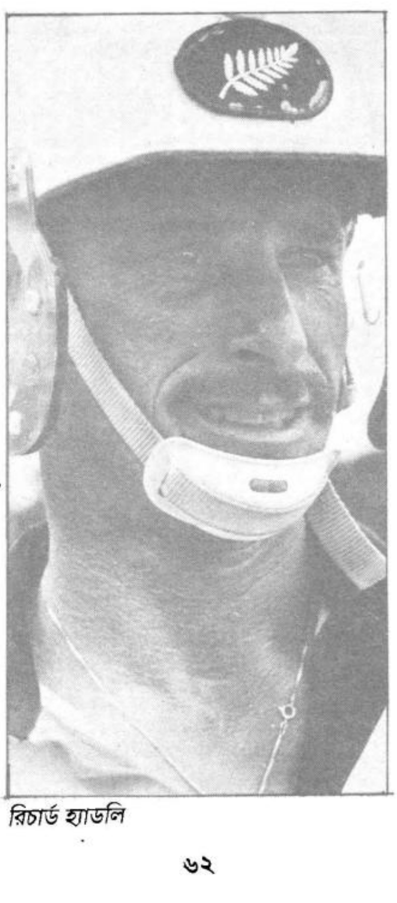

রিচার্ড হ্যাডলি

মার্টিন ক্রো

(মারকুটে জিওফ মার্শ ১১৮, ওয়েন ফিলিপস ৬২ ; ব্রেসওয়েল ৭৪ রানে চার উইকেট, হ্যাডলি ৬০ রানে তিন উইকেট) উত্তরে কোনি-একাদশের ২৫৮ রান (আবার সেঞ্চুরি ফশকে যাওয়া কোনির ৯৩ ; ম্যাথুজ ৬১ রানে চার উইকেট)। ৫৬ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দফায় অস্ট্রেলিয়া ফুরিয়ে গেল ১০৩ রানে (বুন ৫৮ নটআউট ; ব্রেসওয়েল ৩২ রানে ছ' উইকেট, ইয়ান চ্যাটফিল্ড ১৯ রানে তিন উইকেট)। জেতার জন্য ১৬০ রান জোগাড় হয়ে গেল দুই উইকেটেই (জন রাইট ৫৯, কেন রাদারফোর্ড অপরাজিত ৫০)।

নিউজিল্যাণ্ডের এই ধারাবাহিক সাফল্যের পিছনে রয়েছে অনবদ্য টিম-স্পিরিট। সব প্লেয়ারেরই কম-বেশি ভূমিকা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে। তবে আলাদা করে তিনজনের কথা বলতেই হবে।

কোনিসাহেব শুধু একজন ভাল জাতের অলরাউণ্ডারই নন, লাকি ক্যাপ্টেনও। ডান-হাতি বাঘা ব্যাটসম্যান, মিডিয়ামপেস বোলার। একুশ বছর বয়সে তিয়াত্তর-চুয়াত্তর সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট-দলে চান্স পেয়ে তেমন সুবিধে করতে না পেরে বেমালুম ছাঁটাই। ঘরোয়া ক্রিকেটে দাপট দেখিয়ে তেড়েফুঁড়ে উঠলেন বছর পাঁচেকের মধ্যেই। তিরাশি সালের ইংল্যাণ্ড ট্যুরে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে পাকাপাকি ঠাঁই পেলেন টেস্ট-দলে। কুড়ি বছরের মার্টিন ক্রো'ও বিরাশি সালে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ। পরের বছর ইংল্যাণ্ডে উত্তেজক ক্রিকেট খেলে নজর কাড়লেন সবার। চারটে টেস্টে ঝকঝকে ৮১৯ রান। গড়ে ৫৮·৫০। কোনি অনেক সময়েই ঢিলেঢালা, মার্টিনের খেলা বরাবরই অ্যাটাকিং মেজাজের, ক্রিজে এসেই হুড়মুড়িয়ে রান!

এই মুহূর্তে নিউজিল্যাণ্ড-ক্রিকেটের নিউক্লিয়াস, চৌত্রিশ বছর বয়সী রিচার্ড হ্যাডলি, পৃথিবীর সেরা চারজন অলরাউণ্ডারের অন্যতম। যেমন তাঁর ডান-হাতি ফাস্ট বোলিংয়ের ছোবল, তেমনি বাঁ হাতে চোখ-ঝলসানো, মারমুখী ব্যাটিং। টেস্ট ক্রিকেটে ২০০০ রান এবং তিনশো উইকেট হ্যাডলি ও ইংল্যাণ্ডের ইয়ান বথাম ছাড়া আর কারও নেই। পঁচাশির অস্ট্রেলিয়ায় তিনটে টেস্টে তেত্রিশটা উইকেট বাগিয়েছিলেন। তার মধ্যে ব্রিসবেন টেস্টে ৫২ রানে ৯ উইকেট! এক ইনিংসে এর চেয়ে ভাল বোলিংয়ের রেকর্ড রয়েছে দুই ইংরেজের। জিম লেকার আর জর্জ লোম্যান।

এশিয়ার সেরা আশা

রত্না শূর

তিরাশি সালের কথা। দ্বিতীয় ভারতীয় ওপেন ম্যারাথনের শেষ পর্বে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন চলছে। এমন সময় মধুর বিস্ময়ের মতো নেহরু স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে আবির্ভূত হল ছোট্ট একটি মেয়ে। উড়ুক্কু চুলের দুই বিনুনি দুলিয়ে খালি পায়ে মেয়েটি ফুল ম্যারাথনের দূরত্ব (২৬ মাইল ৩৮৫ ইয়ার্ড) অতিক্রম করে এসেছে। কানফাটানো করতালির মধ্যে মেয়েটি ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোষক উত্তেজিত কণ্ঠে লাউড স্পিকারে ঘোষণা করলেন, তিন ঘণ্টা আট মিনিট তিন সেকেণ্ডে আশা নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পরিসংখ্যানবিদ্‌রা জানিয়েছিলেন সাতষট্টি সালের বিশ্ব রেকর্ডের তুলনায় আশার সময় মাত্র ৩৭ সেকেণ্ড বেশি।

জিমনাস্ট আশা ম্যারাথনে এসেই সাড়া জাগিয়েছিলেন। আড়াই বছরের মধ্যেই পাঁচ ফুট উচ্চতা ও মাত্র একচল্লিশ কেজি ওজনের ছোট্ট চেহারার

আশা ভারতীয় ম্যারাথনের সম্রাজ্ঞী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেইসঙ্গে ভারতীয় ম্যারাথনকেও একটা সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন।

চুরাশির মার্চে জাপানের নাগোয়ায় জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে আশা ১৩০ জনের মধ্যে ৩৮তম স্থান দখল করে ব্রিটেনের ম্যারাথন পাইওনিয়র জয়েস স্মিথের নজরে পড়েছিলেন। জয়েস স্মিথ এক জোড়া রানিং শ্যু উপহার দিয়ে সম্ভাবনাময়ী আশার উন্নতি কামনা করেছিলেন। আশা জুতো ব্যবহার না করলেও জয়েস স্মিথের কামনা পূর্ণ করে এশিয়ার সেরা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নাগোয়ার পর সিওল ম্যারাথনে আশা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ম্যারাথনারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চতুর্থ স্থান দখল করেছিলেন। বাকি ছিল আন্তর্জাতিক পদকপ্রাপ্তি। সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে তৃতীয় স্থান দখল করে আশা সেই বুড়ি ছুঁয়েছিলেন। ২ : ৪৫ : ৪০ সেকেণ্ডের রেকর্ডে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসে চমক জাগিয়ে আশা মহিলাদের ম্যারাথনের প্রথম আন্তর্জাতিক পদকটি ভারতে এনেছিলেন। আশার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে যাবতীয় দ্বিমতের অবসান ঘটেছে গত এশিয়ান ট্র্যাক ও ফিল্ড মিটে। সোনার পদক জিতে আশা নিজেকে এশিয়ার সেরা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের ম্যারাথন পাইওনিয়র বাইশ বছর বয়সী আশা সম্পর্কে আমরা কতদূর আশাবাদী হতে পারি? দৌলতরাম কলেজের হিন্দি এম· এ'র ছাত্রী সাত্ত্বিক মারোয়াড়ি পরিবারের আদরের মেয়ে নিরামিষভোজী আশার উত্তর, "আগামী ওলিম্পিক পর্যন্ত।"

আশার বর্তমান সময় গত ওলিম্পিকের একত্রিশতম স্থানের কাছাকাছি। আশার ওলিম্পিক স্বপ্ন নিয়ে শেষ বলার আগে আশা ধাপে-ধাপে নিজের সময় কতটা তৈরি করে নেন, সেটাই এখন দেখবার। পি· টি· ঊষার প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে! প্রায়শ্চিত্তের এমন সুযোগ তো বড় একটা আসে না!

এখন পাওয়া যাচ্ছে

সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সন্দেশ-পত্রিকার শ্রেষ্ঠ রচনা নিয়ে চিরকালীন সংকলন

সেরা সন্দেশ

দাম ৬৫·০০

তৃতীয় পর্যায়ের চলতি সন্দেশ পত্রিকার বয়সও কুড়ি পেরিয়েছে। বারবার পড়বার মতো কত যে লেখা প্রকাশিত এই পত্রিকায়, এবং বারবার দেখবার মতো কত যে ছবি, তার আর ইয়ত্তা নেই। সেইসব লেখা আর ছবি থেকে বেছে নিয়ে, ছেঁকে নিয়ে এই অসামান্য সংকলন।

কী আছে 'সেরা সন্দেশ'-এ ? এর উত্তরে বলতে হয়, কী নেই ? রবীন্দ্রনাথের নাটিকা, শরদিন্দুর সদাশিব-কাহিনী, তারাশঙ্করের গল্প, অজিত দত্তের ছড়া, সুখলতা রাওয়ের কবিতা, ক্ষিতিমোহন সেনের চিঠি, পরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ—এমন সব দুর্লভ লেখার পাশাপাশি এ-যুগের প্রবীণ-নবীন প্রায় প্রত্যেকের সৃষ্টি নিয়ে এই দারুণ বৈচিত্র্যপূর্ণ সংকলন।

কিছুকাল আগে আদ্যন্ত পরিবর্ধিত যে-সংস্করণ বেরিয়েছিল, তারই নতুন মুদ্রণ এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে। আদ্যন্ত সংশোধিত সেই সংস্করণে নতুন কয়েকটি লেখার সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল যতদূর-সম্ভবপর লেখক-পরিচিতি। ম্যাপলিথো কাগজ, লাইনোয় ছাপা, আর্ট পেপারে প্লাস্টিকফিনিশ জ্যাকেট, রঙীন পুস্তানি, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রায় দুশো ছবি ও প্রচ্ছদপট, কাপড়ে বাঁধাই—এ-সব আকর্ষণও কম নয়।

হু-হু করে বিক্রি হচ্ছে

সত্যজিৎ রায়ের

নতুন রসের গল্প সংকলন

তারিনীখুড়োর কীর্তিকলাপ

দাম ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

‘সত্তরের যুদ্ধে’ মোহনবাগান জিতল

সম্রাট রায়

লিগ, শিল্ড, ডুরাণ্ড, রোভার্স কিংবা ফেডারেশন কাপের খেলা নয়। তবু কাঠফাটা রোদ্দুর তুচ্ছ হয়ে গেল যেহেতু খেলাটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আবেগ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা-মাখানো দুটি নাম, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। হোক না প্রদর্শনী-ম্যাচ, হোক না শুধু সত্তরের দশকের ফুটবলারদের নিয়ে নিছকই এক আনন্দময় আয়োজন।

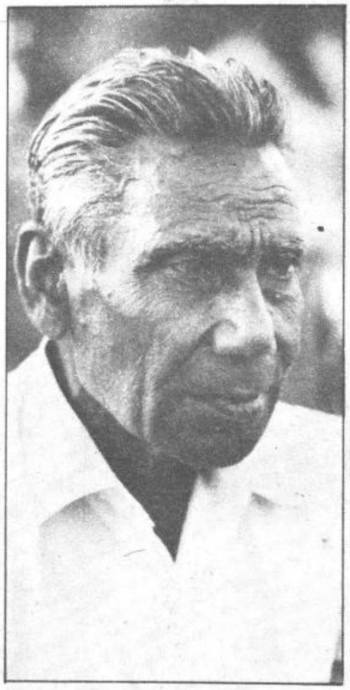

স্বামী নায়ার

কলকাতা ফুটবল লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে যে নামটি আজও রয়েছে অন্যের ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেই স্বামী নায়ারের বেনিফিট ম্যাচে জড়ো হয়েছিলেন সত্তরের দশকের মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের তারকা-ফুটবলাররা। মাঠেও দর্শক হিসেবে হাজির ছিলেন তাঁরা, যাঁরা সেদিনের জমজমাট বিকেলগুলোয় একদা মুখর থেকেছেন সুখস্মৃতির আনন্দে।

অমলিন অতীতের টুকরো-টুকরো স্মৃতি, ফেলে-আসা সোনালি বিকেলের ঐশ্বর্যকে মনের মধ্যে মিলিয়ে নিতে এবং প্রিয় ফুটবলারদের আরও একটিবার দেখে নেবার দুর্নিবার লোভে মাঠে এসেছিলেন হাজার পনেরো মানুষ। আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল ইস্ট-মোহন চিরাচরিত টেনশন।

সত্তরের দশকের মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সেই খেলোয়াড়রা

কে কেমন খেললেন সেটা বড় নয়। কারণ আমাদের জানাই ছিল, বয়স নামক এক অনিবার্য মন্থরতা সেরাদের শরীর থেকে শুষে নিয়েছে যৌবনের চঞ্চলতা, গতি এবং ক্ষিপ্রতা। তবু ওরই মধ্যে পাওয়া গেছে কিছু-কিছু সূক্ষ্ম অনবদ্য ঝিলিক। ঝলসে উঠেছে স্মৃতি, সবুজ ঘাসের বুকে। গোল পাওয়ার চেষ্টায় হাবিবের সেই একগুঁয়ে জেদ, কান্ননের চকিত ক্ষিপ্রতা, ছুরির ফলার মতো ধারালো কাজলের থ্রু, প্রবীরের কভারিং, সুধীরের ট্যাকলিং, গোলকিপার শিবাজির ম্যাজিক সেভ, প্রসূনের ড্রিবলিং, নঈমের রাজসিক ঔদ্ধত্য, সব মিলিয়ে এ-দিনের আসর ছিল পরিপূর্ণ।

বিদেশ এবং মানসের দেওয়া গোলে ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ হারিয়ে মোহনবাগান এই ম্যাচ জিতে লাভ করল চারমিনার চ্যালেঞ্জ ট্রফি। মোহনবাগান জিতলেও এটা অবশ্যই মানতে হবে, দল হিসেবে মোহনবাগান একটু বেশি শক্তিশালী হয়েছিল চারজন প্রায় নিয়মিত ফুটবলার থাকায়। এঁরা বিদেশ, মানস, প্রসূন এবং গৌতম। তুলনায় ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের মধ্যে ছিল বয়সের জড়তা। বয়স্ক ফুটবলারদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে বিদেশ যেভাবে সিরিয়াস খেললেন, সেটা অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বিদেশ ওই বয়সে পৌঁছলে এবং প্রদর্শনী-ম্যাচ খেলতে নামলে তিনিও যে সাদামাটা যে-কোনও রাইট ব্যাকের কাছে আটকে যাবেন, এটা বিদেশের মাথায় রাখা উচিত ছিল। তবু ওর মধ্যে আলাদা করে প্রশংসা করতে হয় কাজল মুখার্জিকে। চুনি গোস্বামীর পরে সর্বোত্তম ফুটবল প্লেয়ার কাজল ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির থেকে এবং আগাগোড়া নির্ভুল পাস বাড়িয়ে দেখালেন বয়সের মরচে শরীরে না থাকলে তিনি আরও কী পারতেন। সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হাজার টাকা পাওয়ার ব্যাপারে কাজলের চেয়ে যোগ্য আর কেউ সত্যিই ছিলেন কি?

এই খেলা উপলক্ষে স্বামী নায়ার পেলেন ৩০ হাজার টাকা। আর্থিক অঙ্কে সংখ্যাটা বিরাট নয়। কিন্তু কলকাতা ফুটবল লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচেষ্টাটি নিঃসন্দেহে মহৎ।

ক্রিকেটারদের গল্প

অশোক রায়

অনেক বড় ক্রিকেটারও অনেক সময় ক্রিকেটের আইন-কানুন ঠিকমতো জানেন না। গ্যারি সোবার্সের মতো বিখ্যাত ক্রিকেটারও একবার নিয়ম না জেনে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ভারতের মধ্যে জামাইকায় প্রথম টেস্ট শুরু হবার কথা। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি। গোটা দিনে বলের আঁচড়ই পড়ল না মাঠে। দ্বিতীয় দিন খেলা শুরু হল। ভারত ওই টেস্টে ধীরেসুস্থে খেলে ৩৮০ রান করল। পালটা ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অল আউট হয়ে গেল ২১৭ রানে। গোল বাধল এরপরই।

ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন অজিত ওয়াড়েকর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন সোবার্সকে বললেন, "তোমরা ফলো-অন করো।"

"ফলো-অন!" সোবার্সের গলা গমগম করে উঠল, "দুশো রানের তফাত না থাকলে যে ফলো-অন করানো যায় না, এই সহজ আইনটা দেখছি, অজিত, তোমার এখনও জানা হয়ে ওঠেনি!"

ওয়াড়েকর খুব ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, "আইনটা আমি ভালই জানি গ্যারি। দুশো রানের যে তফাতের কথা তুমি বলছ, তা পাঁচ দিনের ম্যাচের জন্য। কিন্তু এই টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টিতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ম্যাচটা এখন চারদিনের দাঁড়িয়েছে। তুমি কি জানো, তিন বা চারদিনের ম্যাচে দেড়শো রানের তফাত থাকলেই ফলো-অন করানো যায়?"

সোবার্স মানতে পারলেন না ওয়াড়েকরের কথা। রাগে গটমট করতে করতে সোজা চললেন আম্পায়ারের কাছে। তারপর কথাটথা বলে খানিক পরে যখন ফিরলেন, তখন তাঁকে রীতিমত হতাশ লাগছিল। কী আর করবেন, ড্রেসিংরুমে ঢুকে ওপেনার দু'জনের দিকে তাকিয়ে সোবার্স ক্লান্তভাবে বলে উঠলেন, "প্যাড-আপ।"

☆ ☆ ☆

আইন না জানার আর-একটা মজার গল্প শোনো। ১৯৪৭ সালে ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ চলছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ব্যাট করছিলেন অ্যালান মেলভিল। প্রত্যেক ওভারের শেষ বলে একটা শর্ট রান নিয়ে মেলভিল বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন সঙ্গী ব্যাটসম্যানকে। মেলভিলের সঙ্গীর ব্যাটিংয়ের হাত মোটেই ভাল ছিল না। ইংল্যাণ্ড চাইছিল মেলভিলের সঙ্গীকেই অ্যাটাক করতে। কিন্তু কিছুতেই মওকা পাচ্ছিল না।

ওভারের শেষ বল যথারীতি ঠেললেন লেভিল বাউণ্ডারির ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা লেন হাটনের দিকে। রান নেবার জন্য মেলভিল ছুটলেন। ওদিকে হাটন ভাবলেন, মেলভিলকে যদি এই সিঙ্গল রানটি নিতে দেওয়া হয়, তা হলে ওভার শেষে সেই-ই আবার পরের ওভার খেলবে। হাটন করলেন কী, বলটা কাছে আসামাত্র এক শট মেরে বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে দিলেন। ভাবলেন বাউণ্ডারি হয়ে গেলে মেলভিল আর অন্য প্রান্তে যেতে পারবেন না। কিন্তু আইনের প্যাঁচে পড়ে গেলেন হাটন নিজেই। আম্পায়ার পাঁচ রান দিলেন মেলভিলকে (১টি শর্ট রান, সেইসঙ্গে বাউণ্ডারির চার রান)। ফলে পরের ওভারও খেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন মেলভিল, হাটনের আইন না-জানার জন্যে।

গারফিল্ড সোবার্স

অজিত ওয়াড়েকর

গ্লুকন-ডি সুপারহিরো

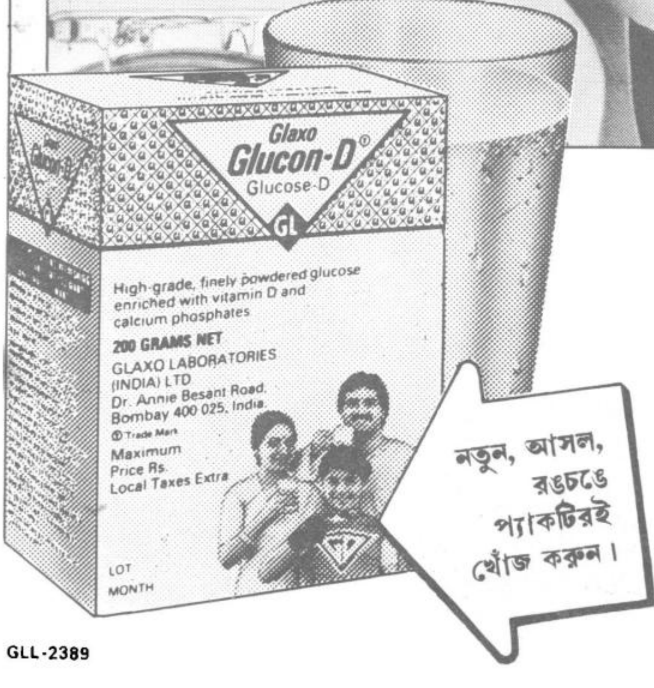

ক্লান্তিকর গরম হোক যতই নিদারুণ, গ্লুকন-ডি দিয়ে আপনার বাচ্চাকে প্রাণচঞ্চল রাখুন – এই নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়তে থাকে গ্লুকোজ, ভিটামিন – ডি এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট।

গ্লুকন-ডি, জ্যুস, দুধ, চা, কফি বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খান, আর, পরিবারের সবাই এক অপূর্ব সতেজ করা পানীয় পান। ১০০ গ্রা., ২০০ গ্রা. ও ৫০০ গ্রা. প্যাকে পাবেন। গ্ল্যাক্সো-র অবদান গ্লুকন-ডি

গ্লুকন-ডি ®

শক্তি যোগানের পানীয়, সুপারহিরোর অতি প্রিয়

GLL-2389

Anandamela 30 April 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH By-South 683TN/MS(c)/731

"আহা রে! বেচারা আমার
রসনা-য় ভাগ বসাতে পারছে না!"

কী কমলা-কমলা গন্ধ!

রসনা

ভারতের সবচেয়ে বেশি বিক্রীর
সফ্ট ড্রিঙ্ক কনসেনট্রেট

Mudra:A:PI:2950 BEN